পুরুষসূক্তম্

Talks delivered by Swami Samarpanananda at Ramakrishna Vivekananda University before the students of Indian Spiritual Heritage Course –

(Transcribed and edited by Amit Ray Chaudhuri)

সৃষ্টির রহস্যের অনেক ধরণের ব্যাখ্যা হয়, নাসদীয়সূক্তম্ তার একটা দিক। নাসদীয়সূক্তম্ হচ্ছে পুরোপুরি দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টির ব্যাখ্যা, অন্য দিকে পুরুষসূক্তম্ হচ্ছে সৃষ্টির রহস্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরেকটি দিক। নাসদীয়সূক্তমের মত পুরুষসূক্তমের দর্শন খুব একটা জটিল নয়। সৃষ্টি নিয়ে আমাদের যে সচরাচর ধারণা, যেগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সেটাকেই পুরুষসূক্তমে পৌরাণিক আকারে কাব্যিক শৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

পুরুষসূক্তমের প্রথম মন্ত্র হচ্ছে – ***সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্।।*** বেদে পুরুষ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয়। বেদে ভগবান বা ঈশ্বর শব্দ আমরা পাইনা, কিন্তু ভগবান বা ঈশ্বর বলতে যা বুঝি বেদে তাঁকেই পুরুষ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার অনেক সময় এই পুরুষকে ইঙ্গিত করা হয় যিনি অন্তর্যামী রূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন। তাই পুরুষের দুটি অর্থ হয় – একটি হচ্ছে বিরাট আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্বরাট। প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে যিনি আছেন তিনিই সেই পুরুষ বা স্বরাট আবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবান রূপে যিনি বিরাজমান তিনিই পুরুষ। এখানে সেই পুরুষের বর্ণনা করা হচ্ছে, তিনি কি রকম? তাঁর সহস্রশীরষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সেই পুরুষের হাজারটি মাথা, হাজারটি চোখ, হাজারটি হাত। বেদে হাজার শব্দটা দিয়ে অনন্তকে বোঝায়। আগেকার দিনের মানুষরা গুনতে জানত না, তাই সাধারণ মানুষদের জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে এই সংখ্যাগুলোর ধারণা করিয়ে দেওয়া হত। এখনও গ্রামে গঞ্জে যেসব মানুষরা হিসেব বা গুনতে জানে না তারা সব কিছুতে কুড়ি দিয়ে হিসেব করে – এক কুড়ি, দু-কুড়ি, তিন-কুড়ি এইভাবে। আগে মানুষ আঙ্গুলের সাহায্যে গুনতো, দুই হাতে পাঁচ যুক্ত পাঁচ দশটি আঙ্গুল আবার পায়ের দশটা আঙ্গুল, সব মিলিয়ে কুড়িটা আঙ্গুল, এই কুড়ির বাইরে কোন সংখ্যা এদের ধারণা ছিল না। কুড়ির বাইরে তারা তাই এক-কুড়ি, দু-কুড়ি এই ভাবে হিসাব করত। যদিও বেদের ঋষিরা সংখ্যার হিসাব জানতেন, কিন্তু কবিতায় কাব্যিক ভাবকে ফোটাবার জন্য ওনারা অনন্তকে বোঝাবার জন্য সহস্র বলে দিলেন।

ঠিক এই ভাবটাই আমরা উপনিষদ ও গীতাতেও পাব, বিশেষ করে গীতাতে খুব প্রচলিত একটি শ্লোক আছে যেখানে বলা হচ্ছে – *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।* (১৩/১৩) – ভগবানের সর্বত্র পা, সর্বত্র তাঁর চোখ, সর্বত্র তাঁর মাথা, সর্বত্র তাঁর কান। এর অর্থ হচ্ছে, ভগবান স্বরূপতঃ নির্গুণ নিরাকার এবং সর্ব্ব্যাপী। তাই তাঁর যে অঙ্গ আছে তা সব জায়গাতেই বিদ্যমান হবে। আবার এইভাবেও ব্যাখ্যা করা হয় – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই তাঁরই চোখ, তাঁরই হাত, তাঁরই মুখ। ভগবানের যে সত্যিকারের হাজারটা হাত, পা, মুখ আছে তা নয়, তিনি অনন্ত। কিন্তু অনন্তকে বর্ণনা করা যাবে না, সংখ্যা দিয়ে তাঁকে মাপা যাবে না, সেইজন্য হাজার শব্দ দিয়ে সেই অনন্তকেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ব্যাখ্যা হয় – ভগবান তিনি সবার সাথেই জুড়ে আছেন, সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন সেইজন্য সব হাতই তাঁর হাত সব চোখই তাঁর চোখ, সব মুখই তাঁর মুখ। মা যেমন সন্তানকে বলে – বাবা, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়। কেন বলছে মা? কারণ মায়ের সাথে সন্তানের এমন একত্ববোধ হয়ে আছে যে সন্তান খেলেই মায়েরও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এখানে মা সন্তানের সাথে জুড়ে রয়েছে।

প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন – *স ভূমিং বিশ্বত বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্* - এখানে ভূমিং বলতে শুধু এই পৃথিবীকেই নয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাচ্ছে। এই পুরুষ পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন কিন্তু তিনি নিজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে একটু বেশি। কতটা বেশি? দশাঙ্গুলম্, মানে দশ আঙ্গুল বেশি। এখন কে মেপে দেখেছে যে ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি? কেউই দেখেনি, এইটাই হচ্ছে ভগবানের মহিমার কাব্যিক ব্যঞ্জনা, এইটাই হচ্ছে কবিত্ব। ফিজিক্সের থিয়োরি অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড যতই বিস্তার হতে থাকুক কিন্তু বেদের কবিতায় পুরুষ সব সময়ই ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি থাকবেন, তার মানে ভগবান সব সময় বড়ই থাকবেন। আমরা যে বলছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবান, তার মানে এই নয় যে এই ব্রহ্মাণ্ড যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে ভগবানও সেইখানেই শেষ হয়ে যাবেন, ব্রহ্মাণ্ড যতই বাড়তে থাকুক ভগবান সব সময় তার থেকে দশ আঙ্গুল বেশি থাকবেন। ভগবান সব সময়ই বড়ই থাকবেন। ভগবানের এই বৈশিষ্ট্যতাকে যতটা কাব্যিক ভাবে প্রস্ফুটিত করা যায় বিজ্ঞানের দ্বারা বোঝা যাবে না। একজন কবি একটা কবিতা লিখেছিলেন A man is born in every second and a man dies in every second. এখন এক বিজ্ঞানীর হাতে যখন এই কবিতাটা পড়েছে তখন সে ঘোর আপত্তি করে বলছেন – মহাশয়, আপনার কবিতাতে একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, মৃত্যু ১.৩ সেকেণ্ডে হয়। কিন্তু কবিতার জন্য ১.৫ সেকেণ্ড মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেন বললেন? কারণ কবিতাকে মেলাতে হবে তো। যখন কোন কবি কিছুর বর্ণনা করবেন তিনি একটা ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক ভাবে বলবেন, আবার কোন যুক্তিবাদী যখন সেই জিনিষটাকেই বর্ণনা করবে তখন সে অন্য ভাবে বলবেন। কিন্তু বিষয় বস্তুর ভাবের মধ্যে কোন তারতম্য থাকবে না।

এই দশাঙ্গুলমের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তি কালে অনেক পণ্ডিতরা এইটাকে আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলছেন যে নাভীমূল হচ্ছে আমাদের সমগ্র শরীরের কেন্দ্রবিন্দু, এই কেন্দ্রবিন্দুর থেকে ঠিক দশ আঙ্গুল উপরে পুরুষের বাস। এখন আমরা সবাই জানি যে নাভিস্থল থেকে দশ আঙ্গুল মেপে মেপে যে জায়গাটায় আসবে সেটাকে বলা হচ্ছে হৃদয়। ভগবান কোথায় বাস করেন? এই প্রশ্ন করলে মোটামুটি সব ভক্তই বলে দেবেন তিনি হৃদয়ে বাস করেন।

মানুষ কুকুরকে ভয় পায়, সেইজন্য যাদের বাড়িতে কুকুর আছে সেই বাড়ির দরজার উপর নোটিশ লাগান থাকে, 'কুকুর হইতে সাবধান'। কিন্তু এইটাই আশ্চর্য যে মানুষ ভগবানকে কখনই ভয় করে না। কোথাও কি লেখা থাকে 'ভগবান হইতে সাবধান'? আমরা কি কেউ ভগবানকে ভয় পাই? একজন মহিলা নিজের স্বামীকে দাবিয়ে রাখে কিন্তু একটা টিকটিকি আরশোলা দেখলে ভয়ের চোটে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে দেব। স্বামী বেচারাদের অবস্থা টিকটিকি আরশোলার থেকেও অধম। আমরাও কুকুরকে ভয় পাই কিন্তু ভগবানকে ভয় পাইনা, কারণ মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, ছলচাতুরি করা সব করছি। ভগবান কুকুরের থেকেও অধম আমাদের কাছে। কিন্তু ঋষিদের কাছে তা ছিল না, তাঁদের কাছে ঈশ্বর হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ, তাই তাঁরা ভগবানকে স্থান দিলেন *অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্*, আমাদের শরীরের কেন্দ্রস্থল থেকে ঠিক দশ আঙ্গুল উপরে হৃদয়ে, ভগবানের বাস সবার হৃদয়ে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ভগবান ছাড়া বাকি সব কিছুই আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এইগুলিতেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের বেদের ঋষিদের ধারণা ছিল – যদি আমি সেই পুরুষকে অন্তর্যামী রূপে দেখে, স্বরাট রূপে দেখি তখন তিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন। আবার যখন বিরাট রূপে দেখি তখন তিনি সবটাতেই আছেন আবার যতটুকু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার থেকেও দশ আঙ্গুল বেশি আছেন। আসল ভাব যেটা ঋষিরা বলতে চাইছেন তা হচ্ছে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সব চোখ তাঁর চোখ, সব মুখ তাঁর মুখ, সব হাত তাঁর হাত, সব পা তাঁর পা। এইটাই গীতাতে যে শ্লোকটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম তাতে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হচ্ছে – ***পুরুষ এবেদগং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতাত্বশেসানঃ যদন্নেনাতিরোহতি।।*** *যদ্ভূতং* যা কিছু হয়ে গেছে, *যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু হবে, *পুরুষ এবেদগং* – এই সবটাই

ঈশ্বরই হয়েছিলেন আবার হবেন। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। এই কথাতে সবাই মনে করেন ঈশ্বরই বস্তু আর বাকী সব ফালতু জিনিষ। আদপেই তা নয়, বক্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই যে বোতলটা আছে এটাকে আমরা কি বলব? বস্তু না অবস্তু? ঈশ্বর রূপে এই বোতলটা বস্তু, আর বোতল রূপে দেখলে অবস্তু। কিন্তু এই বোতলও ঈশ্বরের একটা রূপকে প্রকাশিত করছে। কিন্তু যখনই আমরা এই ঈশ্বরের রূপকে সরিয়ে বস্তু রূপে দেখবে তখনই সেটা অবস্তু হয়ে যাবে। টাকাকে মানুষ কিভাবে দেখে? সবই যদি তিনি হন, তাহলে টাকাকেও ঈশ্বর রূপে দেখতে হবে, গয়নাগাটিতেও ঈশ্বর দেখতে হবে। কিন্তু পুরুষদের সমস্যা হয় তারা একমাত্র টাকাতেই ঈশ্বর দেখে আর মেয়েরা গয়নাতেই ঈশ্বরকে দেখে, এর বাইরে আর কোথাও ঈশ্বরকে দেখতে চায়না। কিন্তু পুরুষসূক্তমে বলছে – *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু হয়েছিল যা কিছু হবে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর বই আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা, সোনার গয়নাতে যে ঈশ্বর দেখছে এতে কোন ভুল নেই, সেখানে ঈশ্বর দেখুক সব ঠিক আছে, কিন্তু এই টাকা-পয়সা, গয়নার বাইরে মানুষ কি দেখছে? স্বামীজীকে এক আমেরিকান বিদূষী মহিলা বলছেন – স্বামীজী আপনি আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সব যা বলছেন শুনতে খুবই ভালো লাগছে, সবই ঠিক বলছেন কিন্তু আমি আমার আত্মার ছবি আমার গয়না, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, আমার নাম যশ প্রতিপত্তির মধ্যেই দেখতে পাই'। স্বামীজী বলছেন 'ম্যাডাম্ আপনি তাই দেখতে থাকুন, কোন আপত্তি নেই, হাজার হাজার জন্ম ধরে এই গুলোর মধ্যে আপনি আপনার আত্মাকে দেখতে থাকুন, আপনার যেখানে দেখে আনন্দ হবে সেখানেই দেখুন, কারণ আনন্দ হচ্ছে ঈশ্বরেরই একটি গুণ, তিনি সচ্চিদানন্দ কিনা। তারপর কোন জন্মে যখন তুমি আঘাত পাবে, কষ্ট পেয়ে চেঁচামেচি করবে, কান্নাকাটি করবে তখন তুমি ঘুরে দাঁড়াবে'। যেখানেই নিরানন্দ সেই জায়গাটা যেন মনে হচ্ছে ঈশ্বরের বাইরে। না সেইটাও ঈশ্বরের মধ্যে, কেননা যা কিছু সবই ঈশ্বর। এইটাই আমাদের মূল সমস্যা, আমরা কিছু জিনিষকে দেখে আনন্দ পাই, কিছু জিনিষকে দেখলে মনে নিরানন্দের ভাব এসে যায়। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের জন্যই আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, কেননা আমরা কিছু পছন্দ মত কর্ম করতে চাই, আমরা আমাদের নিজেদের কিছু পছন্দের লোকের সাথে কথা বলতে চাই, কিছু পছন্দের লোকের সঙ্গ পেতে চাইছি, তারফলে আমাদের যত রকমের দুঃখ-কষ্ট, কথায় বলে যার আছে ভালোবাসা তার আছে ঘৃণার মত দুর্বাসা। অথচ ভগবান যে সবার মধ্যে রয়েছে সেটাকে ভুলে আমরা ভগবানের থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করে চলেছি, কিন্তু পালিয়ে যেখানেই হাজির হচ্ছি সেখানেও ভগবান আগে থাকতেই আমার জন্য বসে আছেন। যখন আমরা কোন কিছুর থেকে পালাচ্ছি, তার মানে এইটি আমার কাছে ভগবান নয়, তার মানে হচ্ছে আমার মধ্যে গলদ রয়েছে। কারণ যার মনে কোন রকমের গলদ থাকবে না তার কাছে *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু আছে সব ভগবানই। যদিও এটাকে তত্ত্বগত ভাবে মেনেও নেওয়া যায়, মেনে নিয়ে বিশ্বাস করে বলছি আমি জানি তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন কিন্তু আমি এখন সব কিছুতে তাঁকে দেখছি না, আমি জানি একদিন আসবে যখন আমি এটা প্রত্যক্ষ করব যে তিনিই সব কিছু, এইটুকুও যদি কেউ ভাবতে পারে তাহলে বুঝে নিতে হবে সে আধ্যাত্মিক পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষতো মানতেই চায়না, এইসব কথা শোনার বা জানার সুযোগই পায়না। কেউ সুযোগ পেলে শুনতে চায়না, কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে দেয়। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অনেকে এসে ঠাকুরের কথা শুনছে, তাদের সঙ্গের বন্ধুরা যারা এসেছে কানের কাছে এসে বলছে আর কতক্ষণ চল না এবার। শেষে যখন উঠছে না দেখছে তখন রেগেমেগে বলছে তুই এইখানে থাক আমরা নৌকাতে গিয়ে বসছি। এইসব আধ্যাত্মিক কথাকে এদের মস্তিষ্ক নিতে পারেনা। পশু জন্ম থেকে প্রথম মানুষ জন্ম হলে এই রকমই হয়ে থাকে।

এই যে সর্ব্ব্যাপী চৈতন্য, যা কিছু আছে সবই চৈতন্যময়, এটা আমি বুঝতে পারছি না এটা আমার দোষ, আমি মানতে পারছি না এটা আমার দোষ। কিন্তু সত্য হচ্ছে ঠাকুর ছাড়া কিছুই নেই। স্বামী নিখিলানন্দজী আমাদের কথামৃতের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, তাছাড়া তিনি গীতা উপনিষদও ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। ওনাকে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলা যেতে পারে। পূর্ব জীবনে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। গীতা উপনিষদের যে অনুবাদ করেছেন বিশ্বে আজ

পর্যন্ত কেউ এত সুন্দর অনুবাদ করেননি। শেষ বয়সে ওনার একজন আমেরিকান সেবক ছিলেন। ওনার সেবক কিছু দিন আগে একটা খুব সুন্দর ঘটনা বলেছিলেন। নিখিলানন্দজীর তখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। একদিন কি একটা কথার পিঠে স্বামী নিখিলানন্দ বলছেন – এইতো আমার সময় হয়ে গেল, আর বেশি দিন হয়তো বাঁচবো না। নিখিলানন্দজী একবার দুইবার এই কথাটা বললেন। অনেকবার এই কথা বলার পর সেবক, যিনি নিখিলানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, থাকতে না পেরে হঠাৎ ইংরাজীতে বলে উঠলেন – Till Sri Ramakrishna is there it does not matter to me who lives, who dies. যতক্ষণ ঠাকুর আছেন ততক্ষণ কে মরল কে বাঁচল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমরা এখানে মন্ত্রের যে অংশটি আলোচনা করছি, খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলে স্বামী নিখিলানন্দজীর সেবকের এই উক্তির মধ্যে এই মন্ত্রের গূঢ়ার্থটা ধরতে পারব।

মনে করা যাক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা কাঁচের জার আর এই কাঁচের জারটাকে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর মনে করা যাক। এই জারের মধ্যে তরল পদার্থে ভর্তি, সেখানে অনেক ধরণের ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী রয়েছে। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের আকৃতিটাও ওর ভেতরে রয়েছে, আর যত গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, তারামণ্ডলী সব ঠাকুরের আকৃতির ঐ কাঁচের জারের মধ্যে রয়েছে। এখন এই কাঁচের জারের মধ্যে কেউ মরল কি বাঁচল তাতে কি আসে যায় যতক্ষণ এই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী কাচের জারটা আছে, কেননা তিনিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। কারণ যা কিছু ওর মধ্যে আছে সবই তো শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর।

নর্থ পোল আর সাউথ পোলে জল জমে বরফ হয়ে যায়। সেখানে বরফের নানান রকমের আকৃতি হয়ে রয়েছে। এখন কোন কারণে একটা বরফের আকৃতি গলে গেল। এখন গলে গিয়ে সেটা কি হবে? জলই তো হবে। জল থেকে বরফ আবার বরফ থেকে জল হয়েই চলেছে, মাঝখানে নানান আকৃতি হচ্ছে। ঠিক সেই রকম আমি মরে গেলাম কি সে মরে গেল তাতে কি আর হবে। মরে গিয়ে যাবেটা কোথায়, রামকৃষ্ণের বাইরে তো সে কোন ভাবেই যেতে পারছে না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া তো আর কিছুই নেই। *ইদম্ সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্,* মানে যা কিছু আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু হবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই হবে না। আমি আপনি শ্রীরামকৃষ্ণেরই একটা আকৃতি আবার যখন আমি আপনি মরে যাব সেই শ্রীরামকৃষ্ণতেই অন্য রূপে থাকব। আমার আপনার যে অস্তিত্ব সেটাও শ্রীরামকৃষ্ণ, আমার আপনার যেটা অনস্তিত্ব সেটাও শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ভাবটা যার মধ্যে দৃঢ় ভাবে বসে গেছে সে কি আর কোন মৃত্যু জনিত দুঃখ বা আঘাত পাবে? ঠিক এই জিনিষটাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *অশোচ্যানান্যশোচস্ত্বং প্রজ্ঞা বাদংশ্চ ভাষসে*। ঈশ্বর ছাড়াতো কিছু নেই। স্বামী নিখিলানন্দজী সেবকের এই কথা শুনে এত উৎফুল্ল হয়ে গিয়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন সেন্টারে ফোনে বলতে লাগলেন যে – দ্যাখো, আমার সেবক কি সুন্দর একটা কথা বলেছে – Till Sri Ramakrishna is there how does it matter to me, who lives or who dies. আনন্দে উদ্দিপ্ত হয়ে বললেন যে এতদিনে তাঁর একজন শিষ্য এই জিনিষটাকে ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে। সত্যি কথা বলতে কি এইগুলোকে নিয়ে যখন গভীর ভাবে চিন্তা করা যায় তখন আমাদের মনের অনেক আজেবাজে ধরণের আবেগগুলি মাথা তুলতে পারবে না। আর যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে মনন করতে থাকবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নেই, এইটা দৃঢ় থেকে দৃঢ় হতে থাকবে। নর্থ পোলে জল ছাড়া কিছুই নেই, ঐ জলটাই বরফ হয়ে নানান আকৃতি নিচ্ছে আবার বরফ গলে গিয়ে সেই জলেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে, জল ছাড়া কিছুই নেই।

আর কি বলছেন *উতামৃতত্বস্যেশানঃ যদন্ননাতিরোহতি* – এই যে পুরুষের কথা বলা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন অমৃতে লোকের মালিক, আবার নশ্বর লোকেরও প্রভু। *যদন্নেনাতিরোহতি* – মানে যারা অন্ন খেয়ে বড় হয় বা বেঁচে থাকে, তাদের যদি অন্ন না জোটে তা হলে তারা মারা যাবে, মানে যারা মৃত্যুলোকের বাসী, তাদেরও তিনি প্রভু। এখানে বলা হচ্ছে – জড় জগৎ, জীবলোক আর অমৃত্লোক এই তিনটিরই তিনি প্রভু। ঈশান, মানে যিনি শাসণ করেন, তিনি হচ্ছেন রাজা, তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা। এখানে তাঁকে

পুরুষ বলা হচ্ছে, আবার পুরানে যেখানে ভাগবত ধর্মের কথা বলা হয়েছে সেখানে যাকে ভগবান বলা হয়েছে, সেই একই পুরুষের কথাই এখানে বলা হয়েছে, আমরা যাঁকে ঈশ্বর বলছি, যাকে ক্রিয়াত্মক শক্তি বলা হচ্ছে সবই সেই পুরুষ। পুরুষের বিশেষত্ব কোথায়? তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কেউ বলতে পারবে না যে আমি ঈশ্বরের বাইরে বা আমি ঈশ্বরের অধীনে নই। এত কিছুর পরেও আমরা ঈশ্বরের থেকে কুকুরকে বেশি ভয় করি – কুকুর হইতে সাবধান, কেন বলি কারণ আমরা ভগবানকে ভয় পাইনা।

ভক্তির দিক থেকে পুরুষসূক্তম্ অনেক বেশি প্রভাবশালী। বেদে গায়ত্রী মন্ত্রের পরই পুরুষসূক্তমের গুরুত্ব। দক্ষিণ ভারতের হাজার হাজার ব্রাহ্মণরা এখনও স্নান করার আগে বা স্নান করার পর পুরুষসূক্তম্ পাঠ করেন।

কিছু দিন আগে একটা গবেষণামূলক তথ্য বেরিয়েছে যাতে বলা হচ্ছে যে – কয়েকজন নিউরো বিজ্ঞানী কিছু পুরুষ মহিলার মুখে মাথায় অনেকগুলো সেনসার্স লাগিয়ে দিয়েছিল। আর সবার অজান্তে ঐ সেনসার্সের গুলোর মাধ্যমে রিমোটের সাহায্যে এই সব পুরুষ মহিলাদের বিভিন্ন কথাবার্তাগুলোকে রেকর্ড করা হচ্ছিল। পরে দেখা গেল যখনই এই সব মহিলা পুরুষরা গ্রাম্য কথা মানে পরনিন্দা পরচর্চা, সাধারণ কথাবার্তা করছে, তখনই তাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্ক এক অসন্তুষ্টির অবস্থাতে চলে যাচ্ছে। আবার এরা যখনই কোন গভীর বিষয় নিয়ে কথা বা আলোচনা করছে তখন লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছিল যে এদের মস্তিষ্ক শান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। এরা কিন্তু বুঝতে পারছে না কখন কি রেকর্ডিং হচ্ছে, আবার বিভিন্ন ধরণের আলোচনার সময় মস্তিষ্ক যে সব ধরণের তরঙ্গ ছাড়ছে সেটাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এরা কি কথা বলছে সেই সময় মনের মধ্যে কি ধরণের তরঙ্গ উঠছে, মস্তিষ্ক কি ধরণের তরঙ্গ ছাড়ছে সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে বেশ কয়েক দিন ধরে বিজ্ঞানীরা কয়েক জনের উপরে পরীক্ষা চালাল। এই গবেষণা থেকে দেখা গেল যে যখনই এরা জাগতিক বা সাংসারিক কথাবার্তা বলছে তখনই মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে পড়ছে, মন বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকের মধ্যেই একই জিনিষ পাওয়া গেল, কারুর মধ্যে এর এতটুকু ব্যাতিক্রম নেই। যখনই কোন গভীর তত্ত্ব আলোচনা করছে, তা যে কোন তত্ত্বই হোক না কেন, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন নিয়ে আলোচনা করছে তখনই মন সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তির অবস্থায় চলে যাচ্ছে।

এই গবেষণা পত্রটি সত্যিই খুব তথ্যমূলক। এই যে বলে, আগেকার দিনে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণরা রোজ সকালে উঠে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, পূজা-অর্চনা করতেন তাঁদের মুখচোখের মধ্যে একটা সৌম্য শান্ত ভাব লেগে থাকত। ভোগের ইচ্ছা, মানসিক চাহিদা সমাজে চিরদিনই ছিল, কিন্তু সামাজিক অনুশাসনে সেগুলো চাপা থাকত, কিন্তু বর্তমান সমাজে এই অনুশাসনের রাশটা আলগা করে দেওয়া হয়েছে। সেদিন আর বেশি দেরী নেই, মানুষের মৃত্যুর কারণ কোন রোগভোগ হবে না, বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে আত্মহত্যা। আজকের খবরের কাগজেই তিন চারটে আত্মহত্যার ঘটনা আছে। মন যখন চঞ্চল হয়ে যায়, নিজের মনের উপর যখন সমস্ত রকমের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। মন কেন চঞ্চল হয়? তার একমাত্র প্রধান কারণ হচ্ছে পরনিন্দা আর পরচর্চা। যত পরনিন্দা আর পরচর্চাকে প্রশ্রয় দেবে ততই জীবন বিপজ্জনক পরিণতির দিকে এগোতে থাকবে। কিন্তু যারা ধর্মপথে চলে, ধর্মাচরণ করেন তাদের কেউই কক্ষণ আত্মহত্যা করতে যাবে না। এটা গেল একটা দিক, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যারাই ধর্মপথে থাকবে তাদের মনে কখনই বিমর্ষ ভাব আসবে না। এখানে যারা শুধু ধর্মীয় আচরণ করছেন তাদের কথাই বলা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্নদের ধরা হচ্ছে না, তাঁরা আরও উচ্চস্তরের মানুষ। যাদের মন সব সময় হতাশায় আচ্ছন্ন, যাদের মধ্যে আত্মহত্যার মনোভাব আছে এরা কখনই ধর্মীয় ব্যাক্তি নন, কারণ এদের ভগবানে কোন আস্থা নেই। যার ভগবানে আস্থা আছে তার কক্ষণ হতাশার ভাব আসবে না, আসতেই পারে না। ভগবানে আস্থা আছে আর মন হতাশাগ্রস্থ এই দুটো কথাই হচ্ছে পরস্পর বিরোধী। কারণ যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁকে চিন্তন করলে কারুর মনে কি নিরানন্দ ভাব আসতে পারে? হতাশা, আত্মহত্যার মনোভাব এগুলো হচ্ছে নিরানন্দ অবস্থার ফসল, আমার মনে কোন আনন্দ নেই ভাবলেই বোঝা যাবে হতাশা তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ, চিরন্তন, চিরকালের, অফুরন্ত আনন্দের

উৎস। সেই উৎসের সাথে একবার নিজেকে যুক্ত করতে পারলে কি তার মনে কখন দুঃখ, হতাশা, বিমর্ষ ভাব আসবে?

এখন যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, ভগবান-টগবান মানে না, তারা কি করবে? খুব ভালো কথা, আপনাকে ঈশ্বর মানতে হবে না, আপনি ঈশ্বরের কথা চিন্তা নাই বা করলেন, কিন্তু আপনি উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকুন, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নান্দনিক শিল্প নিয়ে থাকুন। এর ফলস্বরূপ আপনার মন কখনই বিক্ষিপ্ত হবে না, মন এতেও শান্ত থাকবে। কিন্তু আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের পোষা কুকুরের মত, ইন্দ্রিয় সব সময়ই ভোগ করতে চাইছে, আর মন বুদ্ধিও ভোগের পেছনে ছুটে চলেছে। যে বুদ্ধি দিয়ে উচ্চ চিন্তন হবে, যে বুদ্ধি দিয়ে, যে মন দিয়ে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত হচ্ছে সেই মন, সেই বুদ্ধির সমস্ত তেজ ভোগের রসদ জোগাড় করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভোগ করার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলছে। যখন অনেক দিন ধরে দেখে যে তেঁতুল আর আমড়া খেয়েই চলেছি তখন বাপু সুইসাইড করাই ভালো।

পৃথিবীতে যত প্রাণি আছে, সবারই একেকটা শরীর একেকটা জিনিষকে ভোগ করার জন্যই উপযুক্ত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে এক মহারাজ বলছেন – মহারাজ, আমার তো অনেক কিছুই হল, কিন্তু মাংস খাওয়ার সাধ এখনও মিটল না, তা আমার কি হবে মহারাজ? ভূতেশানন্দজী বলছেন – কি আর হবে, আগামী জন্মে শকুন হয়ে জন্মাবে, তখন খুব করে মাংস খাবে। এই শুনে ঐ মহারাজ ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ এটা ঋষির কথা কিনা। ততক্ষণে ভূতেশানন্দজী ওনার মনের অবস্থা বুঝে নিয়েছেন, তখন ওনাকে ভরসা দিয়ে বলছেন – না না, আমি এমনি মজা করে বলছিলাম। এর তাৎপর্য কি, এই মানব শরীরটা মাংস খাবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। মাংস খাওয়ার শরীর কাদের? সিংহ, বাঘ, শকুন, এরা মাংস খেয়েই থাকে। আমাদের কিছু হলেই ডাক্তাররা বলেন রেড মীট্ খাবেন না। অথচ সিংহ বাঘ এরা মাংস খেয়েই থাকে, আর কি তার প্রচণ্ড শক্তি, কি তার যৌবন। বাঘ, সিংহ কখন ভাত খায়না, ঘাসও খায়না। কিন্তু আমাদের মাংস খেতে বারণ করছে। বাঘ, সিংহের শরীর আর পাকস্থলি এমন প্রক্রিয়াতে গঠিত যে মাংসকে সহজে হজম করে দিয়ে শরীরের পেশীকে সবল করে দেয়। আমাদের শরীরে সেই ক্ষমতাই নেই। যখনই কেউ মদ পান করছে তার শরীরের ক্ষমতা থাকা চাই সেই মদের কেমিক্যালসকে ভাঙ্গার। ভারতীয়দের শরীরে সেই ধরণের জিনই নেই যে মদের কেমিক্যালসকে ভাঙ্গবে। বিদেশীদের শরীরে সেই জিন আছে, সেইজন্য ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা মদ খেয়ে মাতলামো করে না। কিন্তু আমাদের এখানে পেটে একটু মদ পড়লেই মাতলামো শুরু হয়ে যাবে। মানুষের এই শরীর এক উচ্চ অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য, ধর্ম লাভের জন্য, দর্শনের উচ্চ চিন্তনের জন্য, তোমার এই শরীর মাংস খাবার জন্য নয়, মদ খাবার জন্য নয়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই মাংস আর মদের পেছনেই বেশি অর্থ ব্যয় করে চলেছে। যখন ভগবান দেখবেন যে তোমাকে একটা এত সুন্দর মানব শরীর দিলাম যাতে তুমি এক উচ্চ আদর্শকে লাভ করতে পার, কিন্তু সেই চেষ্টা না করে তুমি মাংস, মদ, যৌন লিপ্সাতে মত্ত হয়ে গেলে, তখন ভগবান তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবে মানে এমন এক যোনিতে পাঠিয়ে দেবে যেখানে তোমার এই উচ্চ আদর্শের চিন্তা করতে হবে না খালি মাংস খেতে থাকবে আর বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে।

প্রত্যেক মানুষ যেমন যেমন চিন্তা করবে তার শরীর থেকে সেই চিন্তা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের আলোর আভা বেরোতে থাকে। যখন মানুষ কোন জাগতিক চিন্তা করে তখন তার শরীর থেকে লাল আলো, ভালো উচ্চ চিন্তা করে তখন সাদা আলো আবার মন যখন ক্রোধ, রাগ, হিংসাতে ভরে যায় তখন কালো আলোর আভা ছাড়তে থাকে। মানুষের মন যখন কোন গভীর উচ্চ চিন্তাতে নিমগ্ন হয়, সে যে কোন উচ্চ চিন্তাই হোক না কেন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিকতার মত যে কোন উচ্চ চিন্তা, তখনই সেই মানুষের শরীর খুব শুদ্ধ উচ্চ তন্মাত্রা ছাড়তে থেকে। তখন লাল আলো, কালো আলো বেরনো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন দেখা যায় সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে সবাই ভালোবাসতে থাকে, ব্যাক্তিত্বের

মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি চলে আসে। এগুলো কোন কাল্পনিক কিছু নয়, এই ধরণের আলো সত্যি সত্যি বেরোতে থাকে। আমাদের চোখ ওটা দেখতে পায়না কিন্তু মন ঠিক দেখতে পায়।

এই যে আমরা এখন পুরুষসূক্তম্ আলোচনা করতে যাচ্ছি, এটা অত্যন্ত খুব গভীর উচ্চ চিন্তার বিষয়, রোজ এর তত্ত্বকে যদি চিন্তন মনন করা যায় তাহলে যে কোন মানুষের ব্যাক্তিত্ব পুরো পাল্টে যাবে, কারণ এটা কোন সাধারণ জিনিষ নয়, আমাদের যে আসল সত্তা আছে সে সব সময় তার নিজস্ব স্বভাবকে উন্মোচনের জন্য ছটফট্ করে যাচ্ছে। এই পুরুষসূক্তমের উচ্চ ভাব তার সত্তাকে জাগ্রত করার সুযোগ এনে দিচ্ছে। বেদে ঈশ্বর, ব্রহ্ম শব্দ আসেনা, আর ব্রহ্ম শব্দও সেই অর্থে বেদে আসেনা যে অর্থে পরের দিকে উপনিষদে পাই। বেদে দেবতার কথাই বেশি আসে, ইন্দ্র, বরুণ অগ্নি ইত্যাদি। কিন্তু যখন ভগবান বলতে আমরা যা বুঝি সেই ভগবানকে যখন বেদের ঋষিরা বোঝাতে চাইতেন তখন ওনারা এই পুরুষ শব্দটাকেই বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করতেন।

আমরা আগেই বলেছি যে পুরুষ দুটো অর্থ করা হয় একটা হচ্ছে স্বরাট, যিনি আমাদের ভেতরে আছেন, আর আরেকটি হচ্ছে বিরাট। *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ* - তাঁর সহস্র মাথা, সহস্র চোখ, সহস্র পা বলে বোঝাতে চাইছেন পুরুষ হচ্ছেন অনন্ত। আবার আরেকটি অর্থও করা যায় – সব মাথাই তাঁর মাথা, সব চোখই তাঁর চোখ, সব পা তাঁরই পা। তাঁর বাইরে কিছুই নেই। পুরুষ ছাড়া কিছুই নেই, শুধু তাই নয়, অতীতে যা কিছু হয়েছে ভবিষ্যতে যা কিছু হবে ভগবান ছাড়া কিছুই হবে না, তিনিই আছেন, God alone exists। স্বামীজী এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়েছিল। তার একটি চিঠিতে ম্যাকলাউড স্বামীজীকে লিখছেন – আপনি যে তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে এসেছেন আমি এত দিনে সেটা বুঝতে পারছি যে all is God, সবই ঈশ্বর। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন – সব রামায়ণ বলে দেওয়ার পর প্রশ্ন করছে সীতা কার বাবা, জোসেফিন তুমি আদপেই আমার তত্ত্ব কিছুই বুঝলেনা। আমি কখনই বলিনি যে সবই ঈশ্বর, আমি সব সময়েই তোমাদের বোঝাতে চেয়েছি যে ঈশ্বরই সব। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মকে জোসেফিন বুঝলেন সবই ঈশ্বর। কিন্তু তাই বলে কি এই বোতলটা ঈশ্বর? এই চকটা, এই মাইক্রোফোনটা কি ঈশ্বর? না, বোতলটা, এই চকটা, এই মাইক্রোফোনটা যদি ঈশ্বর হন তাহলে ঈশ্বর সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবেন। ঈশ্বরই এই বোতল, এই চক, এই মাইক্রোফোন হয়েছেন। এইজন্য বলা হয় ধর্মের তত্ত্ব বুঝতে গেলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের মাধ্যমে। গীতায় আছে কোন্ কোন্ আহার সাত্ত্বিক আহার। কাড়ি কাড়ি ভাত মাংস খেলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না। আগেকার দিনের ঋষিরা, ব্রাহ্মণরা হবিষ্যান্ন খেতেন, রাত্রে প্রায়ই উপোস করে থাকতেন, তার ফলে তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছিল। সবই ঈশ্বর আর ঈশ্বরই সব এই দুটি কথা শুনতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার মনে হবে। কিন্তু এই দুটোর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত গূঢ় পার্থক্য রয়েছে সেটাকে ঠিক মত না ধরতে পারলে সমস্ত শাস্ত্র উলোট পালট হয়ে যাবে।

পরের তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন – ***এতাবনস্য মহিমা অতো জায়াগ্শ্চ পুরুষঃ। পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।*** *এতাবানস্য মহিমা* – এই যে জগৎ বলে যা কিছু আছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলে যা কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোধগম্য হচ্ছে, জড়, সজীব, নির্জীব যা কিছু আছে এই সব কিছুই হচ্ছে সেই পুরুষের মহিমা। আসলে সৃষ্টিটাই হচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা। *অতঃ জায়াগ্শ্চ পুরুষঃ* – কিন্তু তাঁর এই সব মহিমা থেকেও তিনি আরও মহিমান্বিত। তাঁর যে মহিমা, তাঁর যে শক্তি, তাঁর যে ক্ষমতা, তাঁর যে ঐশ্বর্য তিনি এই সবের থেকে আরও অনেক অনেক বেশি। একজন কাঙালী সারাদিন খেটেখুটে একশটি টাকা আয় করে, তার সমস্ত কাজের মূল্য হচ্ছে একশটি টাকা, এই একশ টাকাতেই তার সব ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এ হচ্ছে আমাদের সেই গালাগাল দেওয়ার মত, যেটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি – দু-পয়সার কাঙাল আবার বড় বড় কথা বলতে আসছে। তার মানে তোমার যা ক্ষমতা ঐখানেই শেষ। এই সৃষ্টিটা হচ্ছে তাঁর মহিমা, তাহলে কি ভগবান এই সৃষ্টিটা যতটুকু ততটুকুই? কখনই না, যা তুমি দেখছ ভগবান এতটুকুই নন, এর থেকেও তিনি অনেক বেশি। বড় বড় দোকানের মালিকরা শোকেসে কিছু কিছু জিনিষ সাজিয়ে রাখে, কিন্তু

দোকানে শুধু এইটুকুই মাল নেই, গোডাউনে এর থেকে আর অনেক ঢের মাল রাখা থাকে। এই সৃষ্টিটা হচ্ছে ভগবানের শোকেস, গোডাউনে তাঁর আরও অনেক কিছু রাখা আছে। এইটাকেই বলা হচ্ছে এতাবানস্য *মহিমা*। কিন্তু *জ্যায়াগ্শ্চ পুরুষঃ* – পুরুষের এর থেকে অনেক বেশি মহিমা।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন, এই সৃষ্টির থেকে তাঁর মহিমা কতটা বেশি। *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* – এই যা সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ভগবানের এক পাদ মাত্র। আসলে সংস্কৃতে পাদ কথাটা খুব তাৎপর্য্য পূর্ণ। মানুষ সব সময়ই দ্বিপাদ, মানে দুই পা বিশিষ্ট। কিন্তু যখনই পাদ শব্দটা আনবেন তখনই এনারা চতুষ্পাদ নিয়ে বলবেন। পাদের ঠিক আগে চার বলছে, তার মানে পাদ বলতে সমগ্রকে বোঝায় আর চতুষ্পাদ বললেই বুঝতে হবে সমগ্রকে চারটে ভাগ করে তার এক ভাগ বলা হচ্ছে, আমরা যেমন বলি চতুর্থাংশ। যখনই পাদ কথাটা আসবে তখন বুঝতে হবে যে চার ভাগের এক ভাগ বলা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে এটা হচ্ছে পুরুষের চার ভাগের এক ভাগ। আর *ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি* – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে মানে সৃষ্টির বাইরে যা কিছু আছে সব হচ্ছে অমৃত মানে immortal অর্থাৎ পুরুষের চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে mortal আর তিন ভাগ হচ্ছে immortal। জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি যাবতীয় যা কিছু সব এই চারভাগের এক ভাগের মধ্যেই হচ্ছে, বাকি তিন ভাগে কিছুই হয় না।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন এই তিন ভাগ কি অব্যক্ত? আমরা এই দৃশ্যমান এক চতুর্থাংশকে যখন পুরুষের ব্যক্ত বা প্রকাশিত বলছি তাহলে কি তিন-চতুর্থাংশকে কি অব্যক্ত বলব? কখনই এই তিন চতুর্থাংশকে অব্যক্ত বলা যাবে না। কারণ বাংলায় যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় সংস্কৃতে বিশেষ করে শাস্ত্রে এর অর্থ পুরো আলাদা হয়ে যায়। এখানে অব্যক্ত বলা যাবে না, তার কারণ হচ্ছে যা কিছু মায়া বা প্রকৃতি তাকেই অব্যক্ত বলা হয়, এখন এই এক চতুর্থাংশকে যদি ব্যক্ত বলে বাকি তিন চতুর্থাংশকে অব্যক্ত বলা হয় তাহলে ঈশ্বরকে মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছেন ব্যক্ত, অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি এই সব কিছুর পারে। এই তিন চতুর্থাংশ আসলে কি তা কেউ বলতে পারেনা। নাসদীয়সূক্তে বলেছে *কো অদ্ধা বেদ*, কে জানে, কে বলতে পারবে? মানে যদি কিছু জানেন তবে তিনিই জানেন। এই যে আমরা এক চতুর্থাংশ বা তিন চতুর্থাংশের কথা বলছি এটা কি কেউ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপে দেখে নিয়ে তারপর এইসব কথা বলছে? কেউই জানে না। কিন্তু কিছু একটা বোঝাবার জন্য এইভাবে বলছে যা আছে তার এক চতুর্থাংশ হচ্ছে যা কিছু ব্যক্ত দেখছি, আর বাকি চতুর্থাংশের কোন খবর আমরা জানি না, কিন্তু সেইটাই হচ্ছে অমৃত। অমৃতের নীচে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে এর নীচে হচ্ছে দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আর লাইনের ওপরে যা আছে তা ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে। এখন এই লাইনটাকে বলা হচ্ছে অব্যক্ত বা মায়া বা প্রকৃতি। যেমন পুরুষকে বলা যায় না যে তিনি মায়ামুক্ত বা মায়াবদ্ধ, এই লাইনটাকে নীচ থেকে যে অতিক্রম করে উপরে চলে যাব তখন সেটা কি আর মুখে বলা যাবে না, এইটাকেই বলে তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে। মায়ামুক্ত বললেই বুঝতে হবে যে তিনি কোন না কোন সময়ে মায়াতে বদ্ধ ছিলেন। মায়াধীশ বলা হচ্ছে বোঝানর জন্য, আসলে মায়ার সাথে ঈশ্বর বা পুরুষের কোন সম্পর্কই নেই। মায়া, প্রকৃতি, ব্যক্ত, অব্যক্ত যত কথা আছে সব এই লাইনের নীচে। এর ওপরে কি আছে মুখে বলা যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না, মানে আর কোন খপর আসে না। এই লাইনের ঘুনাংশ উপরে গেলেই সব কথা বন্ধ।

ওখানে কি আছে কেউ জানে না, কিন্তু লোকেদের বোঝানর কিছু শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়, সেইজন্য ঋষিরা বলছেন অমৃত। অমৃতের অর্থ যে ওখানে গেলে অমর হয়ে যাবে তা নয়, অমৃত মানে ওখানে কোন ধরণের রূপান্তর নেই, কোন ধরণের বিকার নেই। তাহলে আমরা বুঝলাম একপাদের মধ্যেই যত ধরণের লীলাখেলা চলছে আর বাকি তিনপাদের ব্যাপারে কোন কথা বলা যাবে না। সব কিছুর পার, জীবন-মৃত্যুর পার, সুখ-দুঃখের পার, বাক্য মনের অতীত। অব্যক্ত শব্দ যেই অর্থে বাংলাতে ব্যবহার করা হয় সংস্কৃতে এই ধরণের কোন শব্দই হয় না। ব্যক্ত অব্যক্ত হচ্ছে যেটা দেখা যায় আর যেটা দেখা যায়না,

তার মানে হচ্ছে কার্য আর কারণ, কার্য হচ্ছে জগত, তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতি, সেইজন্য প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতির ওপরে যিনি আছেন তাঁকে নিয়ে কোন কথাই বলা যাবে না। নির্বিকল্প সমাধিতে যে লাইনটার কথা বলা হয়েছিল সেই লাইনটাকে ভেঙ্গে এক হয়ে যায়, সেইজন্য নির্বিকল্প সমাধিতে কি হয় তার কোন উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ মন যে পর্যন্ত যা যাবে সে ততটুকু পর্যন্তই ভাষায় ব্যক্ত করবে, কিন্তু যখন লাইনটাকে ভেঙ্গে সেই তিন চতুর্থাংশের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে তার আগেই মন নাশ হয়ে যাচ্ছে। মন কিছুতেই লাইনকে অতিক্রম করতে পারেনা।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ভগবানের কথা বলতে গিয়ে বলেন God is Transcendent and immanent, এর সব কিছুতেই তিনি আছেন, আর তিনি কি সেখানেই শেষ? না। বাড়িতে আলুর দম রান্না করা হয়েছে। এখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আলু গুলো কোথায়? আলুর দম করে দিয়েছি। আলু গুলি কোথায় আছে? সব শেষ হয়ে গেছে। কোথায় শেষ হয়েছে? আলুর দমে। যে আলু সেটাই আলুর দম হয়ে গেছে। তাহলে তো সব একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেল। ঈশ্বর আর সৃষ্টি কি আলু আর আলুর দম? না। যতটুকু সৃষ্টি হওয়ার হয়ে গেল, কিন্তু ঐ সৃষ্ট যা কিছু হয়েছে ঈশ্বর তার অনেক অনেক বেশি আর তারও অনেক ওপরে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরার এইটাই মহিমা যে এই গূঢ় তত্ত্বগুলিকে কাহিনী আকারে সাধারণ মানুষকে বোঝান হয়। এই তত্ত্বটাকেই একটা বাচ্চাদের কাহিনীতে খুব সুন্দর করে বলা আছে।

কুবেরের কথা আমরা সবাই জানি, বলে নাকি কুবেরের থেকে বেশি ধন সম্পদ আর কারুর কাছে নেই। প্রচলিত আছে যে ভগবান বিষ্ণুর যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন কনেকে সাজাবার জন্য বিষ্ণু কুবেরের থেকে রত্ন ধার করেছিলেন। সেই ধারটাকে মেটানোর জন্য সবাই এখন তিরুপতিতে গিয়ে সোনা, টাকা সব ঢালে। মানে তিরুপতিতে যত প্রণামী পড়ে সব কুবেরের কাছে চলে যাচ্ছে। ভগবান বিষ্ণু এত টাকা কুবেরের থেকে ধার নিয়েছিলেন যে এখনও সেই টাকা শোধ হয়নি। সেই কুবেরের এখন অহঙ্কার হয়েছে, সারা ব্রহ্মাণ্ডে আমার মত এত ধন, সম্পদ, রত্ন কারুর নেই। এত অহঙ্কার হয়েছে যে কুবেরের একবার ইচ্ছে হল শিবকে তার নিজের ঐশ্বর্য দেখাবে। তাই এখন মাঝে মাঝেই কুবের শিবকে গিয়ে আকুতি মিনতি করে বলছে যে – প্রভু আপনি যদি কৃপা করে একবার আমার কুটিরে আপনার পাদস্পর্শ দিয়ে আমার কুটিরে দুটি অন্ন যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাই। আসলে কুবের চাইছে শিব আমার ঘরে এসে আমার ঐশ্বর্যটা দেখুক। এদিকে শিব নানান টালবাহানা করে কুবেরকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শিব হচ্ছে অন্তর্যামী, কুবেরের মনের ভাব শিব বুঝে গেছেন। এদিকে কুবেরও খুব পীড়াপীড়ি করেই চলেছে। শেষে শিব বললেন – তুমি আমার গণেশকে একদিন তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মত তৃপ্তি করে ওকে খাইয়ে দাও। কুবের একটু হতাশ হয়ে গেছে। কি আর করবেন, শিব যখন যেতেই পারছেন না, ঠিক আছে অগত্যা তাহলে গণেশকেই নিয়ে যাওয়া যাক।

গণেশ কুবেরের বাড়িতে এসেই কুবেরকে বলছে – আমার খুব খিদে পেয়েছে, তোমার ঘরে কি খাবার দাবার আছে আমাকে খেতে দাও। এখন কুবেরের ঘরে যত রকমের খাবার দাবার রান্না করা ছিল, যত রকমের ফল ফলাদি ছিল সব গব্‌গব্‌ করে খেয়েই চলেছে। কুবেরের ঘরে খাবার দাবারের বিশাল ভাণ্ডার। সেই খাদ্য ভাণ্ডারে যত রকমের খাবার ছিল গণেশ খেয়েই চলেছে। এত তাড়াতাড়ি সব খাবার শেষ করে দিচ্ছিল যে পরিবেশনের যত লোকজন ছিল সব দৌড়াদৌড়ি করে খাবার পরিবেশন করেই চলেছে। এদিকে যত খাবার মুজত ছিলে সব গেল শেষ হয়ে। তখন আবার নতুন করে খাবার দাবার বানাতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশন করতে দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ গেছে প্রচণ্ড রেগে। রেগে গিয়ে গণেশ বলছে – খাওয়াতে যখন পারছ না তাহলে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলে কেন, কোথায় তোমার রান্না হচ্ছে, কোথায় তোমার রান্নাঘর। চেঁচামেচি করে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। রান্না ঘরে যত রকমের খাবার ছিল সব শুড় দিয়ে টেনে নিয়ে খেয়েই বলছে – তোমাদের খাবারের ভাণ্ডার ঘরটা কোথায়, আমার পেট ভরছে না। এদিকে গণেশের চেঁচামেচিতে চাকর বাকর সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। এখন কুবেরের ঘরে যা কিছু ছিল সব গণেশ তাঁর শুড় দিয়ে টানছে আর পেটে চালান করে দিচ্ছে। কিছুই যখন আর অবশিষ্ট রইল না,

তখন গণেশ কুবেরকে বলছে – তোমার বাড়িতে এসে আমার পেট একটুও ভরল না, তাই এখন আমি তোমাকেই খাব। তুমি আমাকে খাওয়ার জন্য ডেকেছ কেন, আর যদি ডাকলেই তাহলে আমার পেট ভরাতে পারছ না কেন? বলেই কুবেরের পেছনে তাড়া করেছে। কুবের এখন প্রাণপনে ছুটেছে, ঘাম ফেলতে ফেলতে ছুটে এসে শিবের কাছে এসে তাঁর পায়ে পড়ে বলছে – প্রভু আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শিব আগে থাকতেই সব বুঝেই গেছেন। তিনি কুবেরকে কিছু না বোঝার ভান করে বলছেন – তোমার আবার কি বিপদ হল? কুবের বলছে – আমি তো গণেশের পেট ভরাতে পারলাম না, এখন গণেশ বলছে আমাকেই খাবে। তখন শিব গণেশকে বলছেন – এই গণেশ তোমার কি হয়েছে, তুমি অমন চেঁচামেচি করছ কেন? গণেশ বলছেন – আমার খুব খিদে পেয়েছে। শিব তখন গণেশকে মৃদু তিরস্কার করে বলছেন – খিদে পেয়েছে তো মার কাছে যাও, অপরকে কেন খাওয়ার জন্য জ্বালাতন করছ। গণেশ শিবের এক কথাতেই সুরসুর করে মায়ের কাছে চলে গেল। কুবের তখন ভাবছে – আমার অক্ষয় ভাণ্ডারের খাবার দিয়েও গণেশের পেট ভরাতে পারলাম না, অথচ মা পার্বতী এই গণেশকে রোজ পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন কি করে।

বাচ্চাদের এই কাহিনীর তাৎপর্যটা কোথায়? এই ব্রহ্মাণ্ডের যে সব থেকে ধনী সে হচ্ছেন কুবের। কিন্তু গণেশের কাছে কুবেরের ধন রত্ন কিছুই নয়। অথচ দুই বেলা মা পার্বতী গণেশকে পেট ভরে তৃপ্তি করে খাইয়ে যাচ্ছেন, মা পার্বতীর কাছে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু কুবের এক বেলাও তার সর্বস্ব দিয়েও গণেশকে তৃপ্তি করতে পারল না। শিব ধমক দিয়ে গণেশকে বললেন – খিদে পেয়েছে তো মার কাছে যাও অন্যকে কেন বিরক্ত করছ, যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়। এই যে পুরুষসূক্তে বলা হচ্ছে - *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* এক পায়ে ভগবানের সমস্ত সৃষ্টি, এখানে মানে এই এক পাদের মধ্যে যা আছে গণেশ সব খেয়ে নিতে পারে কিন্তু এক পাদের বাইরে গিয়ে আর গণেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক পাদের উর্দ্ধে সব হচ্ছে অনন্ত, ওখানে আমাদের কিছুই চলবে না, ওখানে গিয়ে সব শেষ হয়ে যাবে, শিব ভগবান কিনা। ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্যবান, এটাকে বাচ্চাদের কি করে বোঝাবে। তাই একটা খুব সুন্দর সহজ সরল গণেশের কাহিনী দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল। কুবের, যিনি এই সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে বড়লোক, কিন্তু কুবেরের ঐশ্বর্য ভগবানের ঐশ্বর্যের সামনে একটা চিনির দানার থেকেও ক্ষুদ্র। কুবেরের কাছে যা সম্পদ আছে এটাও শিবের, কিন্তু শিবের ঐশ্বর্য এরও পারে। পুরানের মধ্যে যত রকমের আজগুবি কাহিনী আছে তার যে কোন একটা কাহিনীকে যদি চোখ কান বন্ধ করে বেছে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তার মধ্যে বেদের কোন একটা মন্ত্রের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব রয়েছে, সেই তত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বেদের একেকটা ভাবকে নিয়ে ঋষিরা যুগোপযোগী করে আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য এই পৌরানিক আখ্যায়িকা গুলি রচনা করে বেদের তত্ত্বগুলিকে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শিব ও পার্বতী হচ্ছেন অনন্ত ঐশ্বর্যের মালিক, তাঁদের কোন দিন চিন্তা করতে হয় না যে ঘুম থেকে উঠে গণেশকে কি খাওয়াবেন এমনই তাঁদের অক্ষয় ভাণ্ডার, গণেশও কোন দিন টের পায়না কিভাবে তার পেট ভরে যাচ্ছে দুবেলা, এমনই ভগবানের ঐশ্বর্য।

চতুর্থ মন্ত্রে এই ভাবটাকেই আরও বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে – ***ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোহস্যেহাহহভবাৎপুনঃ। ততো বিশ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।*** এই সব মন্ত্রের মধ্যে এত গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব রয়েছে যে, যে কোন একটা মন্ত্রের ভাবকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করা যায়। যে ভাগটাকে ত্রিপাদ বলা হচ্ছে, এই ত্রিপাদকেও একটা অংশের ভাগ বলা হচ্ছে, কিন্তু পুরুষ এই ত্রিপাদেরও উর্দ্ধে, তিনি সমস্ত পাদকেও অতিক্রম করে যান। এই ত্রিপাদেই কোন বিকার নেই। আর *পাদোহস্যেহাহহভবাৎপুনঃ* কিন্তু যে এক পাদের কথা বলা হয়েছে এইখানেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকে। এই এক পাদের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে বার বার বিভিন্ন যোনির মধ্য দিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। ত্রিপাদে কক্ষণ কিছু হয় না, ওখানে কোন ধরণের বিকার নেই, কিন্তু এই এক পাদে সব কিছু বার বার পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, বার বার দৃশ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, ধর্মের প্রশিক্ষণ তার যেমন যেমন হবে, সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করে তার বিজ্ঞান হচ্ছে, সাহিত্য হচ্ছে, তার কলা থেকে সব কিছুই হচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই যে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা গুলো খ্রীষ্ট ধর্মেরই দান, তাই পাশ্চাত্যের

বিজ্ঞানীরা খ্রীশ্চান ধর্মের পরম্পরাতে যে সৃষ্টির ধারণা আছে তার থেকে কিছুতেই বেরোতে পারেনা, আইনস্টাইনও পারেননি, অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও সেখান থেকে বেরোতে পারেনি। ইদানিং কালে যখন অত্যাধুনিক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের ধারণা গুলো খ্রীশ্চানদের ধারণা থেকে সরে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এখনও তারা সেই পুরনো ধ্যান ধারণাকে ছাড়তে পারছে না।

বিজ্ঞানের একটা ধারণা হচ্ছে যে ভগবান এই সৃষ্টিটা একবার করে দিয়ে চালু করে দিয়েছেন, আর এর মধ্যে যা কিছু হবার, আসা যাওয়া সব এর মধ্যেই চলছে। এই সৃষ্টি একবার হয়ে গেছে আর সৃষ্টি হবে না। পরে ফিজিক্সের বিগব্যাঙ থিয়োরি এল। এখন এই থিয়োরিতে বিজ্ঞান বলছে সৃষ্টির এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয়েছিল সেটা আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু তারপর থেকে আমরা সৃষ্টির সব বলে দিতে পারি। এই কথা বলে দেবার পর বিজ্ঞান দেখছে অনেক কিছুই হিসেবে মিলছে না। তারপর দশ বারো বছর আগে ফিজিক্সের আরেকটি নতুন থিয়োরি এলো যেটা আগের সব থিয়োরিকে পুরো উড়িয়ে দিল। তাদের থিয়োরিতে বলছে বিগব্যাঙ হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে তারপর আবার সঙ্কুচিত হতে হতে একটা পয়েন্ট সাইজে গোটা সৃষ্টি চলে যাচ্ছে, তারপর আবার বিগব্যাঙ বিস্ফোরণ হয়ে সৃষ্টি সামনে আসছে আবার ছোট হতে হতে পয়েন্ট সাইজে চলে যাচ্ছে আবার বিগব্যাঙ – এইভাবে সৃষ্টি একবার আসছে আবার যাচ্ছে। ফিজিক্স আর গণিতের হিসেবে এই থিয়োরি দেওয়া হয়েছে, তারা বলছেন এই হিসেবটা না হলে সৃষ্টিকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই থিয়োরির নাম দেওয়া হয়েছে Cyclic Theory of Universe, যদিও এখনও অনেক পদার্থ বিজ্ঞানী এই থিয়োরিকে মানে না। আমাদের শাস্ত্রের কাছে এই থিয়োরির নাম হচ্ছে কল্প। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের ঋষিরা আজকের বিজ্ঞানের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বলেছিলেন কল্প। কল্প মানে? *যথাপূর্বং অকল্পয়ন্*, এর আগের বারে সৃষ্টি যেমনটি হয়েছিল এবারেও সৃষ্টি ঐভাবেই ঐ একই প্রণালীতে এগোবে, নতুন কিছু হবে না। এখন ফিজিক্সও এই একই কথা বলছে। এই যা সৃষ্টি হচ্ছে এটা এই এক পাদের মধ্যেই আর বাকী তিন পাদে কিছুই হয় না, ওখানে যা আছে তা এক ভাবেই আছে, কোন কিছুর বিকার নেই সেইখানে। আমরা চিন্তাই করতে পারিনা ত্রিপাদে কি আছে। আমরা সমুদ্রের উপমা নিয়ে চিন্তা করতে পারি, যেমন সাতটি সমুদ্র আছে, সমুদ্র যেমন আছে তেমনই থাকে কিন্তু নর্থ পোল আর সাউথ পোলে যে সমুদ্র আছে সেখানে ঠাণ্ডার সময় জল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে আবার গরমের সময় বরফ গলে জল হয়ে যায়। সৃষ্টি হচ্ছে অনেকটা এই রকম। ভগবান হলেন এই সমুদ্রের মত, এই সমুদ্রে কিছুই হয় না, তাঁরই এক ছোট্ট অংশে কখন সমুদ্রেরই জল বরফ হয় আবার কখন বরফ গলে সমুদ্রের জল হয়ে যায়। যেখানে বরফ হচ্ছে সেইটাও তিনি, এই অংশটাও সমুদ্রের বাইরে নয়। সৃষ্টির বাইরে যা আছে সেটাও তিনি আবার জলটাও তিনি বরফটাও তিনি। *অভবৎ পুনঃ* জল থেকে বরফ আবার বরফ থেকে জল এটা বার বার হচ্ছে, হয়েই চলেছে, একবার হয়েই যে শেষ হয়ে যাবে তা নয়।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে নানান রকমের যে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণার কথা বলা হয়েছে, এই যে বলা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে চলছে, অবতাররা আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন, সব কিছুই এই মায়ার লাইনের নীচেই হয় – *অস্য ইহ অভবৎ পুনঃ*, যা কিছু বিকার, যা কিছু সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি সব এই এক চতুর্থাংশের মধ্যে।

ততঃ বিশ্বঙ্ব্যা-ক্রামৎ - *বিশ্বঙব্যর* অর্থ হচ্ছে বিবিধ সৃষ্টি। কি বিবিধ? বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী মানে দেবতা, মানুষ, তির্যক যোনি, পশু, পাখি সব তিনিই হয়েছেন। *অক্রামৎ*, তিনিই সব কিছুতেই ব্যপ্ত হয়ে আছেন, সে সাপ হোক বিছে হোক, দেবতা হোক, মানুষ হোক সব কিছুতেই তিনিই ব্যপ্ত। *সাশন অনশনে, সাশন* হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া করে আর *অনশনে* মানে যে খাওয়া দাওয়া করে না। এবারে পুরো অর্থটা দাঁড়াচ্ছে দেবতারা যারা আছেন অন্যান্য জীব যারা আছে, যারা খাওয়া দাওয়া করে। দেবতারা খাওয়া দাওয়া করে না, দেবতাদের খাওয়ার প্রয়োজনই হয় না, সূক্ষ্ম জিনিষেই তাঁদের সব মিটে যায় কিন্তু মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ এদের খাওয়া দাওয়া করতে হয় তা নাহলে শরীর থাকবে না। আর কারা খায়না? যেমন পাথর, পাহাড়, নদী এরা খাওয়া দাওয়া করে না। এদের সবেতে কে আছেন? ভগবানই ব্যাপ্ত, *বিশ্বঙব্য-ক্রামৎ*, ভগবান নিজেকে সব কিছুতে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কিছু

নেই যেটা ঈশ্বরের ব্যাপ্তির বাইরে রয়েছে। আর এই ব্রহ্মাণ্ড কতটুকু? বলছেন ভগবানের খুব ছোট্ট একটা অংশ হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ড। গীতাতে দশম অধ্যায়ে শেষ লাইনে ভগবান এসে বলছেন – *বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ*(১০।৪২)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তোমাকে আর কি বেশি বলব, শুধু এইটুকু জেনে নাও যে আমার একটি ছোট্ট অংশে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান হচ্ছে। এই শ্লোকটা পড়ে মনে হবে যেন শ্রীকৃষ্ণ আত্মশ্লাঘা করছেন। এটি কোন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মশ্লাঘা নয়, এই উক্তিটা সরাসরি বেদ থেকে এসেছে। এটা কোন দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কিংবা স্কেল দিয়ে মাপার জিনিষ নয়, এই ভাবটাই এখানে বলতে চাইছেন যা কিছু জড় বস্তু আছে তার থেকে চৈতন্য অনেক উপরে।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটাকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের দুটো প্রকৃতি, একটা হচ্ছে পরা প্রকৃতি আরেকটি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি। সেখানে দুটি শ্লোকে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর আরো পরিষ্কার করে ভগবান বলে দিয়েছেন – *ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৪।। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।৫।।* ভগবানের যে পরা প্রকৃতি আছে সেখানে কিছুই হয় না, সেখানে না আছে কোন বিকার, না আছে বৃদ্ধি বা ক্ষয়, না আছে জন্ম না আছে মৃত্যু। যা কিছু এই অপরা প্রকৃতিতেই হবে। অপরা প্রকৃতি হচ্ছে জড়, জড় হলেও তার স্বাভাবিকতাও সেই চৈতন্য, সেইজন্য জীব, দেবতা এরাও এই অপরা প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্গত। যারা খাওয়া দাওয়া করে আবার যারা খাওয়া দাওয়া করে না তারাও আছে। তার মানে বলতে চাইছে সমস্ত কিছু জড় প্রকৃতি, চেতন প্রকৃতি, জীব জগৎ সবটাই তিনি।

পঞ্চম মন্ত্রে বলছেন – ***তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি-পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ***।। পুরুষসূক্তমের এটি খুব কঠিণ একটি মন্ত্র। এখানে দুটো তিনটে পুরুষের কথা এসে যাবে। বলছেন তস্মাৎ মানে সেই আদি পুরুষ, আদি পুরুষ হচ্ছেন ভগবান, যেহেতু বেদ ভগবান বলে না, এখানে বেদ বলছে আদি পুরুষ। সেই আদি পুরুষ থেকে বিরাড জায়ত, বিরাটের জন্ম হল। এই বিরাটকে বলা হচ্ছে যে সেই আদি পুরুষ থেকে ডিম রূপে বিরাটের জন্ম হল, যাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, মানে সোনার ডিম। সেই ডিমের আকার বিশাল। বলছেন সৃষ্টির যা কিছু হবে সেটা প্রথমে ডিম আকারে জন্ম নেয়। প্রথমে বললেন সেই আদি পুরুষ থেকে বিরাটের জন্ম, সেই বিরাটের থেকে আবার *বিরাজো অধি-পুরুষঃ* অধি-পুরুষের জন্ম হচ্ছে। কেউ যদি বলে বাবার থেকে ছেলের জন্ম আবার সেই ছেলের থেকে বাবার জন্ম হল, এটা কি কখন বোঝা যায়? আমাদের বেদে প্রায়ই একটা ধারণার খুব উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল – 'ক' থেকে 'খ' এর জন্ম আবার 'খ' এর থেকে 'ক' এর জন্ম হচ্ছে। যেমন অনেক জায়গায় বলা হচ্ছে যে জিনিষ থেকে ইন্দ্রাদির জন্ম আবার ইন্দ্রাদির থেকে সেই জিনিষের জন্ম হচ্ছে। এটা বেদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পুরানেও একটা ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে বলছে ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকেই সৃষ্টিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মন থেকে সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্রহ্মা দেখলেন এতে প্রচুর সময় অপচয় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সৃষ্টি এগোচ্ছিল না, ব্রহ্মা চাইছিলেন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটা গতি দিতে। তখন ব্রহ্মা নিজেকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তিনি নিজেকে একটা ভাগে পুরুষ আরেকটা ভাগে নারী করে নিলেন। এই নারী আর পুরুষ থেকে সৃষ্টিটা এগোতে লাগল।

পুরুষসূক্তমের এই অধি-পুরুষের মনু তিনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুরানের এই ধারণাকে ভিত্তি করে মনু বলছেন, ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে পুরুষ বলে সম্বোধন করা হয়। তারপর ব্রহ্মা যখন নিজেকে পুরুষ আর নারীতে দুইভাগে বিভক্ত করলেন, তার যে পুরুষ অংশ তাকেও পুরুষ বলা হয়। আর তাদের থেকে যে পুরুষদের জন্ম হল তাকেও পুরুষ বলা হয়। সেইজন্য এইখানে বলা মুশকিল পুরুষকে কি অর্থে বলতে চাইছেন। কিন্তু এর সহজতম ব্যাখ্যা হচ্ছে, বিশেষ করে পরের দিকে আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেটা ব্যাখা করা হয়েছে এবং বেদান্তও যেটা মেনে নিয়েছে, সেটা হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মধ্যে যখন মায়ার আবরণ এসে যায়, যেমন একটা বিরাট আলো আর তার সামনে একটা বড় পর্দা টাঙানো হয়েছে, এখন এই পর্দার মধ্যে দিয়ে যখন আলোটাকে দেখা হবে তখন আলোটা অন্য রকম দেখাবে। এখন পর্দার বদলে যদি একটা

আতস কাচ সূর্যের আলোর সামনে ধরা হয় তখন আতস কাচটা যেখানে যেখানে ধরা হবে সেখানেই আলো পড়বে আবার কাচের রঙ যেমন যেমন হবে আলোর প্রতিফলনের রঙও সেই রকম হবে। এই আতস কাঁচটি হচ্ছে মায়ার মত। এখন এই সূর্যের আলো সর্বব্যাপী। এবারে একটা আতস কাচ লাগিয়ে দিলে সেইখানে আরেকটা সূর্যের জন্ম হয়ে গেল। সেই সূর্য এখন নীচে চলে গেছে, আকাশের সূর্যও সূর্য আর আতস কাচের মধ্য দিয়ে যে সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাও সূর্য। এবার নীচে যে সূর্য দেখা যাচ্ছে এটাও একটা পুরুষ। ঠিক এই রকম সচ্চিদানন্দ যখন মায়াকে ভেদ করে নীচে যে ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাও একটা পুরুষ। তার মানে দাঁড়াল মায়ার ওপারে যে পুরুষ, সেই ভগবান, সেই সচ্চিদানন্দকে মায়ার এপারে যখন দেখা যাচ্ছে তারও নাম আরেকটি পুরুষ। সেই সচ্চিদানন্দকে বলা হচ্ছে আদি পুরুষ আর মায়ার নীচে যে সচ্চিদানন্দকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম হচ্ছে অধি-পুরুষঃ। মায়া শব্দ কিন্তু বেদে নেই। কিন্তু সৃষ্টির সময়কার কথা বলতে গিয়ে যে বলা হচ্ছে একটি পাদ, ঐটাকেই বলছে বিরাট। এই বিরাটের মধ্যেই যেটা সব থেকে বেশি ব্যক্ত তাঁকেই বলা হচ্ছে ভগবান।

আমরা যে নর্থ পোল আর সাউথ পোলের কথা বললাম, এখন মনে করা যাক সেখানে হিমালয়ের সাইজের বরফের পাহাড় হয়েছে আর সেখানে বরফের একটা ছোট্ট টুকরোও আছে। হিমালয় আর বরফের টুকরো দুটো স্বভাবত একই জিনিষ, কারণ দুটো জিনিষই বরফ দিয়ে তৈরী, কিন্তু হিমালয় হিমালয় আর বরফের পাথর পাথরই। পাথরটা এখন বলতে পারে – ওহে হিমালয় তুমিও যা আমিও তা। কোন অর্থে বরফ বলতে পারে? যে জিনিষ দিয়ে আমরা দুজনে তৈরী হয়েছি, সেই অর্থে পাথর আর হিমালয় এক। কিন্তু দুজনকে এক বলার আগে তাদের দুজনকে জলে পরিণত হতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ বরফ রূপে আছে ততক্ষণ হিমালয় বিরাট, আর পাথর ক্ষুদ্র। এই যে চার ভাগের এক ভাগের কথা বলা হয়েছে, এই একপাদ হচ্ছে বিরাট রূপে ভগবান বা ঈশ্বর, আর ছোট যে বরফের পাথর সেটা হলাম আমরা। এই হচ্ছে শিব আর জীবের স্বরূপ। শিব হচ্ছে সব থেকে বৃহৎ প্রকাশ আর জীব হল অতি ক্ষুদ্র রূপে আমরা বিভিন্ন প্রাণী। যেটাকে জড় বলছি সেটাও একই, সজীব নির্জীব দুটোই সেই চৈতন্যেরই, সেই আদি পুরুষরেই অভিব্যক্তি। পার্থক্য মাত্র তার আকারে, বিশালত্বতে।

এখানে যে অধি-পুরুষঃ বলছেন এই অধি-পুরুষ হচ্ছেন ঈশ্বর। আর এই ঈশ্বর হচ্ছেন এক চতুর্থাংশের যা কিছু আছে তার শাসন কর্তা। গীতাতে এই আদি পুরুষ আর অধি-পুরুষকে একই বলা হচ্ছে, ঈশ্বর আর ব্রহ্মকে এক বলা হয়। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের মাঝখানে মায়া রয়েছে বলে আলাদা মনে হবে কিন্তু মায়াকে সরিয়ে দিলে ঈশ্বর আর ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এই মায়ার জগতে ঈশ্বর হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আদি পুরুষ থেকে সৃষ্টি, সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে যখন সেই আদি পুরুষকে অবলোকন করা হচ্ছে তখন তিনিই হয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, যিশু। মায়ার আবরণে সেই সচ্চিদানন্দকে বিভিন্ন যুগে এই এই রূপে দেখা যায়। এঁকেই পুরুষসূক্তে অধি পুরুষ বলা হচ্ছে।

পঞ্চম মন্ত্রে পরের লাইনে বলছেন – *স জাতো অতিরিচ্যতে পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ* যিনি নিরাকার তিনি যখন সাকার রূপ ধারণ করলেন, সেই আদি পুরুষ যখন অধি পুরুষ হলেন তখন এই সৃষ্টির জগতে তাঁর নানা রকমের ক্ষমতা এসে গেছে। এখন তিনি নিজেকে বিস্তার করে সৃষ্টিকে এগিয়ে দিতে শুরু করলেন। কি রকম ভাবে তিনি সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন? এখন যেন বিরাট থেকে জড় আর আত্মা বা চৈতন্য আলাদা হয়ে গেছে। বিরাট হচ্ছে জড় রূপে আর পুরুষ আত্মা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এখন এই জড়কে নিয়ে তিনি সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন। তাঁর কাছে অফুরন্ত পদার্থ এসে গেছে সেই পদার্থ দিয়ে নিজেকে বিস্তার করতে করতে তিনি চারিদিকে ছড়িয়ে গেলেন। সেইখান থেকে পৃথিবীর জন্ম হল, তারপর নানা রকমের জীব জন্তুর জন্ম হল। আসলে এটি হচ্ছে একটি খুব উচ্চ মানের কবিতা, এই কবিতার মধ্য দিয়ে একটা সহজ তত্ত্বকে বোঝাতে চাইছেন, তা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। এই একটি তত্ত্বকে কবিতার শৈলীতে, নানা তুলনাত্মক বিষয় দিয়ে, নানা কথার মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন।

এখানে যেটা মূল কথা বলতে চাইছেন তা হচ্ছে, তিনি সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আবার ঢুকে যান। খুব সহজ উপমা হচ্ছে, মানুষ একটা বাড়ি তৈরী করল তারপর সেই বাড়িতে ঢুকে গেল। এই জগৎকে তিনিই সৃষ্টি করলেন তারপরে তার মধ্যেই তিনি প্রবেশ করে গেলেন। তাই এই সৃষ্টিটাও পুরুষ আর তিনি নিজেও পুরুষ। কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নয়, এই জড়টাও ঈশ্বর, তাঁরই একটা অংশ যেন জড়ের মত দেখাচ্ছে। আর সেই জড়ের মধ্যেই তিনি আবার ঢুকে যান। যখন তিনি জড়ের মধ্যে ঢুকে যান তখন তিনি আত্মা রূপে, যেমন দেহের মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থান করেন। কিন্তু এই দেহ যেটা আছে সেটাও আত্মা ছাড়া কিছুই নয়, আবার এই দেহের ভেতরে যিনি জীব আছেন তিনিও আত্মা ব্যতিরেকে কিছুই নন। তবে এর একটা হচ্ছে পরা প্রকৃতি আরেকটি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি হচ্ছেন সেই আত্মা আর অপরা প্রকৃতি হচ্ছে এই দেহ। দেহের সৃষ্টি আছে আবার যার সৃষ্টি আছে তার নাশও আছে। কিন্তু আত্মার সৃষ্টিও নেই নাশও নেই। এক চতুর্থাংশের কথা যেটা বলা হয়েছে সেইটুকুই বারবার সৃষ্টি হচ্ছে আবার লয় হচ্ছে, ঐটুকুর মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকে। জড়ের আবার জন্ম-মৃত্যু কেন হচ্ছে? ওর মধ্যে তিনি ঢুকেছেন বলেই জড়ের নানান খেলা চলে। তিনি যদি জড়ের মধ্যে না প্রবেশ করেন তাহলে কিছুই হবে না।

ষষ্ঠ মন্ত্রে বলছেন – ***যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।*** এই মন্ত্রটাও একটি কবিতা, কবিতার মাধ্যমে সেই তত্ত্বটাকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা দুর্ধর্শ রূপককে ব্যবহার করা হচ্ছে, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। বলছেন, দেবতারা ঠিক করলেন এই যে পুরুষ, যে পুরুষ এক চতুর্থাংশের মধ্যে রয়েছেন, সেই অধি পুরুষকে আমরা যজ্ঞে বলি দেব। দেবতারা এখন যজ্ঞ করবেন আর সেই যজ্ঞে এই অধি পুরুষকে বলি দেবে। তখন তো সৃষ্টি হয়নি, জীব জন্তু কিছুই জন্ম নেয়নি, যজ্ঞ করতে গেলে নানান রকমের জিনিষের দরকার। অগ্নিকুণ্ড দরকার, অরণি কাষ্ঠের দরকার, ঘৃত ও আরও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছুর দরকার। তাহলে দেবতারা কিভাবে যজ্ঞ করল? তাই দেবতারা মনে মনে এই যজ্ঞটা শুরু করল। *বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ* দেবতারা আহুতি দেওয়ার জন্য বসন্ত ঋতুকে ঘি বানালেন, গ্রীষ্ম ঋতুকে অরণি কাষ্ঠ বানালেন, শরৎ ঋতুকে হবি রূপে বানালেন। অনেকে প্রশ্ন করেন যে দেবতারা হঠাৎ কি করে ঠিক করলেন যে বসন্ত ঋতুকে ঘৃত করা হবে? এর উত্তরে বলা হয় যে দেবতারাও নাকি ধ্যান করলেন। কি ধ্যান করলেন? আগের কল্পে সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছিল। ধ্যানের মাধ্যমে দেবতারা জানলেন যে আগের কল্পে বসন্ত ঋতুকে এই ভাবে যজ্ঞের ঘৃত করা হয়েছিল। যখন ধ্যানে দেখলেন যে এর আগের কল্পেও এইভাবেই যজ্ঞ করা হয়েছিল। তখন তারা ঠিক করলেন এই কল্পেও আমরা যজ্ঞ করব, সেই যজ্ঞে বসন্ত ঋতুকে ঘি করা হবে, গ্রীষ্ম ঋতু হবে কাঠ আর শরৎকাল হবে তার হবি। তখন কিছুই নেই কিন্তু দেবতারা এসে গেছেন, দেবতাদের সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন দেবতারা যদি যজ্ঞ না করেন তাহলে বাকি অংশের সৃষ্টি হবে না। এখানে যদিও পুনরাবর্তশীল সৃষ্টিকে বোঝাতে চাইছে কিন্তু এখানে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এর সবটাই হচ্ছে মানসিক প্রক্রিয়া। সবটাই মনে মনে, ধ্যানের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, যা কিনা এই পুরুষসূক্তমের মূল নীতি তা হচ্ছে – যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে সব পুরুষ নিজেই হয়েছেন। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব তিনি নিজেই হয়েছেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কিছু নেই।

যজ্ঞে সেই পুরুষকে বলি দেওয়া হল, তাঁর অঙ্গ থেকে পৃথক পৃথক হয়ে হয়ে যা যা হচ্ছে সব তিনি নিজেই সেই সেই বস্তু হচ্ছেন। সোজা কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে ভগবানকে কেটে কেটে বলি দিয়ে নানান জিনিষের সৃষ্টি হল। কারা বলি দিলেন? এই দেবতারা। কি ভাবে বলি দিলেন? ধ্যানের মাধ্যমে। এই ধ্যানের ব্যাপারটাকেই একটা কাব্যিক আঙ্গিনায় বর্ণনা করা হচ্ছে। যতই কাব্যিক হোক না কেন, আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সত্যকে, সেই সত্য হচ্ছে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। এখানে পুরুষকে যজ্ঞের পশু রূপে বলি দেওয়া হচ্ছে। বলি দেওয়ার পর তাঁর শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গ থেকে এই জগতের যা কিছু আছে সব সৃষ্টি হল। এখন যজ্ঞের পশু এসে গেছে, ঘৃত এসে গেছে, অরণি এসে গেছে, হবিও তৈরী হয়ে গেছে।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হচ্ছে – ***তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।*** দেবতারা যখন মনে মনে ঠিক করলেন এই যজ্ঞ করা হোক, তখন সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন এসে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন, সাধ্য – মানে এক শ্রেণীর উচ্চস্তরের সিদ্ধপুরুষ, আর ঋষিরা। তখনও কিছুই সৃষ্টি হয়নি কিন্তু দেবতারা এসে গেছেন, ঋষি ও সিদ্ধগণও যজ্ঞ দেখার জন্য এসে গেছেন। এনারা সবাই সেই পুরুষকে বদ্ধ করে তাঁর উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবার তাঁকে বলি দেওয়া হবে। তার আগে সেই পুরুষকে কুশ ঘাসের উপরে রাখা হল। এখন দেবতারা সেই পুরুষকে ধরে যজ্ঞের আসনে উপবেশন করালেন। সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ এই যজ্ঞটাকে অবলোকন করবেন।

অস্টম মন্ত্রে এসে বলা হচ্ছে – ***তস্মাদ্যজ্ঞাৎ-সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূগ্স্তাগ্শ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।।*** এখন সেই পুরুষের বলি দেওয়া হচ্ছে। পুরুষকে যখন বলি দেওয়া শেষ হয়ে গেছে তখন সেই পুরুষ থেকে কি কি জন্ম নিল? এই পুরুষ থেকে ঘিয়ের জন্ম হল, এর আগের যে ঘিয়ের কথা বলা হয়েছিল সেই ঘি ছিল কল্পনার। এবার যে ঘিয়ের জন্ম হল এটা হচ্ছে আসল ঘি, ঘি হচ্ছে দুধের সার। তারপর সেই পুরুষ থেকে বাতাসে চলাফেরা করে সেই সকল প্রাণির উদ্ভব হল, মানে পাখিদের জন্ম হল। অরণ্যে যে সব পশুরা থাকে সেই সব পশুদের জন্ম হল, আর গ্রামে বা লোকালয়ে যে পশুরা বাস করে তাদেরও জন্ম হল। পুরুষসূক্তম্ একটা কবিতা কিনা তাই কবিতার ভাবে বলা হচ্ছে যে পাখিরা জন্ম নিল, বন্যপশু আর গৃহপালিত পশু সবারই জন্ম হল এই পুরুষের থেকে। কেউ বলবে যে গরুতে ভগবান আছে আর বাঘের মধ্যে ভগবান নেই, তা বললে হবে না, গরুতেও তিনি বাঘেতেও তিনি। তিনিই সব হয়েছেন, এইটাকে বোঝাবার জন্যে একটা একটা জিনিষকে সামনে নিয়ে এসে কবিতার মত ব্যখ্যা করে বলা হচ্ছে।

নবম মন্ত্রে বলছেন – ***তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাগংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।।*** দেবতাদের যজ্ঞ যখন সমাপ্ত হয়ে গেলে তখন সেই যজ্ঞ থেকে বেদ বেরিয়ে এল, বেদের সাথে বেদের যে চারটি অঙ্গ, সেই চারটি অঙ্গও বেরিয়ে এল। *ঋচঃ* – ঋক, ঋচ হচ্ছে ঋক। বলা হয় পুরুষসূক্তমেই আমরা প্রথম ঋকবেদ হিসেবে ঋচের কথা উল্লেখ পাই। *সামানি* – যজ্ঞ থেকে সামগান বেরোলে। *ছন্দাংসি* – এই যজ্ঞ থেকে ছন্দের উদ্ভব হল। এখানে যে ছন্দের কথা বলা হচ্ছে এই ছন্দকে অনেকে কবিতার বিভিন্ন যে ছন্দ আছে সেই ছন্দের কথা বলছে, আবার অনেকে পুরুষসূক্তমের এই ছন্দ অথর্ববেদকে বোঝাচ্ছে। *যজুস্তস্মাদজায়ত* – সেইখান থেকে যজুর্বেদ বেরোল। ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে বেদ চারটি, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলেন। কেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলেন, তার কারণ হচ্ছে – এক জায়গাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বেদের আরেকটি নাম হচ্ছে ত্রয়ী। এই ত্রয়ীর অর্থ হচ্ছে ঋক, সাম ও যজু। এই ত্রয়ীকে ধরেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলে আসছে। আসলে এই ঋক, সাম ও যজুকে ছন্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে – ঋক হচ্ছে এক বিশেষ ছন্দ, সাম হচ্ছে যেটা গান হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর যজু হচ্ছে গদ্যাকারে ছন্দ, যা যজ্ঞে আহুতির সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে এখানে আমরা কবিতা, গান আর গদ্যকে পেয়ে গেলাম, তাহলে অথর্বকে আমরা কি বলব। সেই কারণে অথর্বের কথা বেশি আসত না বলে বেদকে ত্রয়ী বলা হত। পরবর্তি কালে এই অথর্ববেদের আরেকটা নাম দিল ছন্দ এবং একে এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য রূপে গণ্য করতে শুরু করতে থাকল, কারণ অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পদ্য ও গদ্য দুটোই পাই। এই কারণে অথর্ববেদকে নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। এই সব কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যে করেই হোক দেখাবেন যে বেদ তিনটেই ছিল আর পরের দিকে অথর্বকে বেদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের পণ্ডিতরা কখনই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কথাকে স্বীকার করেন না, তাঁরা মনে করে এই চারটে বেদ এক সাথেই আর একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। এইখানেই তার উল্লেখ করা হচ্ছে – ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব এই যজ্ঞ থেকেই বেরিয়েছে। এর উত্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আবার বলেন যে পুরুষসূক্তম্‌কে ঋকবেদে পরে ঢোকান হয়েছে, মানে পুরুষসূক্তম্ লেখা হয়েছে পরে কিন্তু ঢুকিয়ে দিয়েছে আগে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভাবলেন না যে যারা বেদ মুখস্ত করতেন তাঁরা কি এতই মুর্খ ছিলেন যে পরের দিককার রচনাকে আগের রচনার সাথে মিশিয়ে

দিয়েছে, বেদের ঋষিরা কি কখন এত বড় একটা জালিয়াতি করতে যাবেন? এই হচ্ছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গী, এক কানাকড়ি এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। এরা প্রাণপনে চেষ্টা করে যাবে যে পুরুষসূক্তম্ অনেক পরে রচিত হয়েছে। স্বামীজী বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিদেশীদের বলছেন – আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন বেদ লেখা শেষ করে দিয়েছে তখনও তোমাদের পূর্বজরা নিজের গায়ে মুখে রঙ লাগিয়ে বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তোমরা কি করে আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে আস। গতকাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড আমেরিকার লোকেরা ছিল বর্বর জলদস্যু, তারা আবার এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে আসে।

তারপর দশম মন্ত্রে বলছেন – ***তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।*** ঐ যে আদি পুরুষ, যাঁকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়েছে, সেইখান থেকে এখন জন্ম নিল ঘোড়া। এমন সব প্রাণীরা জন্ম নিচ্ছে যাদের দুটি করে চোয়াল আছে, মানে ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ও গরু। এখানে গরুকে বিশেষ কোন স্থান দেওয়া হয়নি, অন্য সব পশুর মতই গরুরও জন্ম হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে বিশেষ করে পৌরানিক সাহিত্যে গরুকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। তার কারণ তখনকার মানুষরা এত বেশি গরু খেতে আরম্ভ করে দিয়েছিল যে চাষবাসের জন্য গরুর আকাল হয়ে গিয়েছিল। তখন গরুকে মা, দেবী ইত্যাদি বানিয়ে এই গোহত্যাকে কোন রকমে আটকান হয়েছে। বেদে এইজন্য গরুকে বিশেষ কোন মাহাত্ম্য দেওয়া হয়নি, কারণ ছাগলের যেখান থেকে জন্ম গরুরও সেইখান থেকে জন্ম হয়েছে। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছে, কারুর মনে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তারপরেই প্রশ্ন উঠছে।

একাদশ মন্ত্রে এই প্রশ্নই করা হচ্ছে – ***যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কাবূরূ পাদাবুচ্যেতে।।*** এই যে যজ্ঞ হল, যজ্ঞে এই যে বলি দেওয়া হল, এখন সেই আদি পুরুষকে কিভাবে বলি দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে কটি টুকরো করা হয়েছিল? সেইখান থেকে আর কি কি জিনিষের উৎপত্তি হল, যেগুলো উৎপন্ন হল তাদের আকার কি রকম হল? সেই পুরুষের হাতগুলো কি হল, তাঁর মুখ কি হল, তাঁরা উরু, পা এগুলোর কি অবস্থা হল? অর্থাৎ এই যে পুরুষকে বলি দেওয়া হল, তাঁকে যে ভাবে টুকরো করা হয়েছিল, সেই টুকরো থেকে কি কি সৃষ্টি হল সেটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এইখানে এসে সব থেকে বিতর্কমূলক একটি মন্ত্রের উল্লেখ পাই। এই একটি মন্ত্রকে নিয়ে আম্বেদকর থেকে শুরু করে যত নেতা, রাজনীতিবিদরা এখনও চেঁচামেচি করে যাচ্ছেন। কিছু দিন আগেও একটা গোষ্ঠি থেকে দাবী তোলা হয়েছে যে পুরুষসূক্তমের সব কটা কপিকে জ্বালিয়ে দেওয়া উচিৎ।

দ্বাদশ মন্ত্রে সেই বিতর্কমূলক কথা বলা হচ্ছে – ***ব্রাহ্মণোঽস্যমুকমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাগং শূদ্রো অজায়ত।।*** সেই আদি পুরুষ, যাঁকে বলি দেওয়া হল, তাঁর যে মুখ সেই মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হল, তাঁর যে বাহূ, সেইখান থেকে ক্ষত্রিয়ের জন্ম হল, যদিও ক্ষত্রিয়ে শব্দটা বলা হয়নি, এখানে বলা হয়েছে রাজন্যঃ, রাজন্যঃ বলতে বোঝায় যারা রাজ কর্ম করেন। সেই পুরুষের উরূ থেকে বৈশ্যদের জন্ম হল। আর তাঁর পা থেকে শূদ্রের জন্ম। যারা জাতিপ্রথাকে আঁকড়ে রেখেছেন তারা এই মন্ত্রটাকে খুব নিন্দা করেন। তারা বলেন পুরুষসূক্তম্ ব্রাহ্মণদের বড় বানিয়েছে যেহেতু তারা সেই পুরুষের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। শূদ্র যেহেতু সেই পুরুষের পায়ের থেকে জন্ম নিয়েছে তাই শূদ্রকে ছোট করা হয়েছে। এটা গেল পুরুষসূক্তমের সমালোচনার একটা দিক। দ্বিতীয় যেটা তারা সমালোচনা করে তা হচ্ছে – পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করে যে বৈদিক যুগে কোন ধরণের জাতিপ্রথা ছিল না, এই যে এখানে চারটে বর্ণের কথা বলা হয়েছে, এই চারটে বর্ণ নাকি বেদের সময়ে ছিল না। তার মানে যখন এই ধরণের চারটে বর্ণকে যে মন্ত্র উল্লেখ করেছে, নিশ্চয়ই তাহলে এই মন্ত্র পরে লিখে ঋকবেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের বড় করার জন্য এইভাবে পুরুষসূক্তম্ রচনা করে ঋকবেদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে।

এই দুটো সমালোচনাই আমাদের মতে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ শুধু মাত্র পুরুষসূক্তমের মধ্যেই নয়, এর আগেও বেদের বিভিন্ন জায়গায় জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যখন বেদের আলোচনা শুরু করেছিলাম সেখানে যজুর্বেদের একটা মন্ত্রের কথা উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা হয়েছিল, সেই মন্ত্রে এই চারটে জাতির কথা বলা আছে। আরেকটি

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, যখন কোন সমাজ ব্যবস্থায় একটা শ্রেণী যখন বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিতে শুরু করে, আর এই সুযোগ সুবিধা নেওয়াটা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং আরেকটা শ্রেণীর উপর শোষনের নিপীড়ন চলতে থাকে তখন সমাজের মধ্যে একটা উচ্চ-নীচ ভেদের মনোভাব জন্ম নেয়। যে কোন সমাজে শোষক ও শোষিত যদি থাকে তখন এই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের মনোভাব আসবেই আসবে। যদি একটা চিনির পুতুল বানান হয়, আর চারজনকে এই চিনির পুতুলটাকে খাওয়ার জন্য বলা হল। একজন মুণ্ডুটা নিল, একজন হাতটা নিল, একজন উরুর অংশটা নিল আরেকজন পায়ের অংশটাকে নিলেন। এখন এই চারজন কি কোন আলাদা জিনিষ পেলেন? একজনের অংশটা তেতো, আরেকজনেরটা মিষ্টি, অনেরটা নোনতা আর চতুর্থজনেরটা কি ঝাল লাগবে খাওয়ার সময়? যে পায়ের দিকটা পেয়েছে সে যদি যে মাথা পেয়েছে তার সাথে মারামারি শুরু করে – তুমি কেন মাথা নিলে আমাকে কেন পা দিলে? এর কি কোন উত্তর আছে? সবটাই তো চিনি। আচ্ছা, এবার এই চারজনের প্রত্যেককে এক কাপ করে চা দেওয়া হল। এখন চায়ের কাপে যে মাথাটা পেয়েছিল সে মাথাটা ঢেলে দিল, যে পা পেয়েছিল সে সেই পা টাকে চায়ের কাপে মিশিয়ে দিল, এখন কি এদের একজনের চা কি ঝাল হবে আরেকজনের চা কি তেতো হবে? সবার চা মিষ্টিই হবে। কিন্তু যদি এরা মাথা, পা, হাত নিয়ে মারামারি শুরু করে দেয় – আমি কেন প্রত্যেক দিন এই চিনির পা টাই পাব, মাথা কেন পাবো না? এই ধরণের ছেলে মানুষী কথার কি কোন সদুত্তর আছে? পুরুষ, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি নারায়ণ, যিনি নিরাকার তাঁর মাথা আর পায়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য করা যায়? এই সাধারণ ব্যাপারটাকে আমরা কিছুতেই লোকেদের বোঝাতে পারব না। চিনির পুতুলের মাথা আর পায়ের মিষ্টত্বের পার্থক্যটা বাস্তবে না থাকলেও আস্বেদকরের মত বরেণ্য অগ্রগণ্য কিছু নেতাদের মাথার মধ্যে বসে আছে। এখন যদি উল্টোটা হত, ব্রাহ্মণরা যদি বড় না হয়ে শূদ্ররা বড় হয়ে যেত তখন জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যেতে। এরা পা আর মাথাকে কেন ছোট বড় করছে? কারণ আমার যে মাথা মানে আমার যেটা বড় জিনিষ সেটা আমার থেকে যে বড়, জেষ্ঠ্য, শ্রেষ্ঠ তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ছে। এখন যদি মনে করি পা একটা নীচের জিনিষ সেখানে গিয়ে আমার মাথাটা পড়ছে, এটাতো আমার চিন্তা। কিন্তু একজন যে প্রতিবন্ধী, তার কাছে পা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি মাথাতে চিন্তা হয়, মাথাতে বুদ্ধি আছে তাই মাথা হচ্ছে পায়ের থেকে বড়। এগুলো হচ্ছে বালবুদ্ধির পরিচয়। কিন্তু আসল সমস্যার জন্ম হয়েছে শোষন আর নিপীড়ন থেকে। যে শোষিত হয়ে আসছে, যে নিপীড়িত হয়ে আসছে তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে এই মন্ত্রটি এত বিতর্কিত হয়ে গেছে। আসলে নারায়ণ যিনি, তাঁর শরীরের কোন্ অংশ থেকে কি সৃষ্টি হচ্ছে এটা কোন পার্থক্যই তৈরী করছে না।

কোন্টা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় এই বিচার করতে আমরা এখানে আসিনি, পুরুষসূক্তমে কি আছে সেটাকে জানা আর তার দর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে মূল কথা হচ্ছে এই যে চারটি বর্ণ বা জাতি, এই চারটি জাতিই ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই তত্ত্বটাই গীতায় এসে ভগবান বলছেন – *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারামপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।* (৪/১৩)।। এই চারটি বর্ণ আমিই সৃষ্টি করেছি, আমার থেকেই এদের সৃজন হয়েছে। এই জগতের এমন কিছু নেই যেটা আমার থেকে আলাদা, যেটা আমার থেকে সৃষ্টি হয়নি। ঈশ্বরের থেকেই সব হয়েছে, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু আছে সবই তিনি। এই যে বর্ণ ব্যবস্থা এটাও তাঁরই সৃষ্টি।

ত্রয়োদশ মন্ত্রে বলেছেন – ***চন্দ্রমা মনসো জাতঃ চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুর-জায়ত।।*** সেই পুরুষ, যাঁকে বলি দেওয়া হল, তাঁর মন থেকে চন্দ্রমা বেরিয়ে এল। যেখান থেকে যা যা বেরিয়েছে, পরে ধীরে ধীরে সেইটারই ঐ অঙ্গ বা স্থানের অধিষ্ঠাত্রি দেবতা হয়ে গেছে। যেমন এইখানে বলছে পুরুষের মন থেকে চন্দ্রমার জন্ম হয়েছে, এখন মনের দেবতা হয়ে গেলেন চন্দ্রমা। যারা মানসিক রোগী তাদেরকে ইংরাজীতে বলা হয় lunatic patient, লুনাটিক শব্দটা কোত্থেকে এল? Lunar থেকে। লুনার মানে চাঁদ, অর্থাৎ চাঁদের স্থান খারাপ হয়ে গেছে। এই জন্যই হয়তো সত্যি সত্যি দেখা যায় পূর্ণিমা অমবস্যাতে মানসিক রোগীদের পাগলামো বেড়ে যায়। কারণ পূর্ণিমা অমাবস্যাতে মন উত্তাল হয়ে যায়, সেইজন্য একাদশী ব্রত করতে বলা হয়, একাদশী ব্রত করলে শরীরের শক্তিটা একটু কমে যায় তাই তিন

দিন বাদে যখন পূর্ণিমা অমবস্যা হবে তখন মনটা শান্ত থাকে। *চক্ষোঃ সূর্যঃ অজায়ত* – তাঁর চোখ থেকে সূর্যের জন্ম হল, সেইখান থেকেই সূর্য হয়ে গেলেন চোখের দেবতা। বলা হয় চোখ আর সূর্যের সাথে নাকি একটা যোগ আছে। সম্রাট আকবর এক সময় সূর্যের উপাসনা শুরু করেছিলেন, খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। *মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুর অজায়ত* – সেই পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নির জন্ম হল, তাঁর নিশ্বাস থেকে বায়ু জন্ম নিল, যার জন্য বায়ু হচ্ছে প্রাণের দেবতা।

চতুর্দশ মন্ত্রেও একই ভাবে বলা হচ্ছে সেই পুরুষের শরীরের কোন কোন অংশ থেকে কি কি জন্ম নিল – ***নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষম্ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাগং অকল্পয়ন্।।*** এই যে অন্তরীক্ষ, এর জন্ম নিল সেই পুরুষের নাভি থেকে। তাঁর মাথা থেকে স্বর্গের সৃষ্টি হল, এখানে স্বর্গ হচ্ছে অন্তরীক্ষের উপরে যে লোক সেই স্থানের কথা বলা হচ্ছে। তাঁর পা থেকে ভূমির সৃষ্টি হল, দশটি দিক তাঁর কর্ণ থেকে জন্ম নিল। এইখান থেকে কর্ণের অধিষ্ঠাত্রি দেবতা হলেন দিকসমূহ। *তথা লোকাং অকল্পয়ন্* - এই ভাবেই দেবতারা বিভিন্ন লোকের কল্পনা করলেন। এখানে শব্দটা হচ্ছে অকল্পয়ন্, এখানে এই শব্দ দিয়ে সামগ্রিক সৃষ্টিটাকে বোঝাচ্ছে। আসলে দেবতারা এইভাবেই জগতের একটা আকার দিয়েছিলেন অথবা এইভাবেও বলা যায় যে এই যে জগতকে আমরা দেখছি, এটাকে দেবতারা এই ভাবেই মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। এই যজ্ঞটা হচ্ছে পুরো মানসিক যজ্ঞ, এখন পশুকে যেমন যজ্ঞে বলি দেওয়া হয় ঠিক সেইভাবে পুরুষকে বলি দেওয়া হচ্ছে, দেবতারা এখন বলি দিয়ে দিয়ে জগতকে এইভাবে একটা আকার দিলেন, আর দ্বিতীয়তঃ এটা হচ্ছে মানসিক যজ্ঞ, এখন জগত এইভাবে সৃষ্টি হোক এইটা দেবতারা মনে মনে কল্পনা করতে লাগলেন। মহানির্বাণ তন্ত্রেও এইভাবেই নিজের যে চিন্তা ভাবনা আছে সেই চিন্তা ভাবনাকে দিয়ে এটাকে জল, এটাকে ফুল, এটাকে বস্ত্র ভাবা হয়।

এর পরে সৃষ্টিকে নিয়ে যখন আমি ধ্যান করব তখন ব্রাহ্মণকে যখন চিন্তা করব তখন ভাবব যে এই ব্রাহ্মণ হচ্ছে সেই পুরুষের মাথা, যখন শূদ্রকে দেখব তখন ভাবব সে হচ্ছে তাঁর চরণ। কার চরণ? শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ। আমাদের মাথা তো সর্বদা তাঁর চরণেই দিতে চাইছি। আমরা কি আর শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় গিয়ে মাথা ঠেকাই? যখনই কোন শূদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াব তখন আমরা ভাবব যে সে হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ, এখানেই আমার মাথাকে নত করতে হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে দেখব, একজন শূদ্রকেও ঠিক সেই একই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে হবে। কারণ আমাদের সব কিছু, আমার আমিত্ব, ব্যাক্তিত্ব সব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। এই গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবটা পুরুষসূক্তমের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনম্র ভাবে, গভীর ভাবে হৃদয়ে এই ভাবটাকে ধ্যান করতে হবে।

পঞ্চদশ মন্ত্রে বলছেন – ***সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয়ঃ ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।*** যজ্ঞে বলি দেবার জন্য যে পশুকে রাখা হয়েছে, বলা হচ্ছে সেই পশুকে সাত রকম ভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে। এইটা হচ্ছে যজ্ঞের একটা বিধি। এটারই আবার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, বেদে যে সাত রকমের ছন্দ আছে, সেই সাত রকমের ছন্দ দিয়ে যজ্ঞের পশুকে ঘিরে রাখা হয়েছে বা সাত রকমের ছন্দ দিয়ে তাঁর অর্চনা করা হচ্ছে। *ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ* – যজ্ঞের জন্য কটি কাঠ লাগবে? সাত গুণিতক তিন, মানে একুশটি কাঠের টুকরো যজ্ঞের জন্য লাগবে। ভারতীয় পরম্পরার ঐতিহ্যে সাত সংখ্যাটি খুব পবিত্র সংখ্যা রূপে ভাবা হয়। এই সাত সংখ্যা দিয়েই সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সাগর, অগ্নির সাত রকমের জিহ্বা। এই ভাবে সব আয়োজন করে দেবতারা যজ্ঞ পশুকে বলি দিল। কে যজ্ঞ পশু? সেই আদি পুরুষ।

শেষ মন্ত্রে বলছেন – ***যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ তানি ধর্মাণি প্রথমান্যসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।*** পুরুষসূক্তমের প্রথম মন্ত্রটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষসূক্তমের মূল ভাবটা শেষ মন্ত্রে এসে ফুটে উঠেছে। এই যে কথাটা *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ* – যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের পূজা সম্পন্ন হল, কিভাবে করল? দেবতারা সেই পুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়ে। আমরা যখন কালী পূজায় পশু বলি দিই তখন সেই পশুকে বলির দ্বারা মা কালীকেই অর্পণ করছি। ঠিক সেই রকম এখানেও বলি দেওয়া হল, কার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল? সেই পুরুষের প্রতি উৎসর্গ করার জন্য বলি দেওয়া হল। কাকে বলি

দেওয়া হল? সেই পুরুষকেই। তার মানে, যেটা করা হচ্ছে সেটা যজ্ঞ, বলি দেওয়া হল এটাও যজ্ঞ, যাকে বলি দেওয়া হল সেও সেই পুরুষ, বলি দেওয়াটাও যজ্ঞ, যার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল সেও সেই পুরুষ, তিনিও যজ্ঞ। সবটাই যজ্ঞ। যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের প্রতি যজ্ঞ করা হল। দেবতারা কিভাবে পুরুষের পূজা করলেন? যজ্ঞের দ্বারা। কিভাবে যজ্ঞ করা হল? পুরুষকে বলি দিয়ে। তিনটেই এখানে যজ্ঞ। যাকে বলি দেওয়া হচ্ছে সে যজ্ঞ, যার প্রতি বলি দেওয়া হচ্ছে তিনিও যজ্ঞ, আর যেভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটাও যজ্ঞ। ঠিক এই ভাবটাই আমরা পাই প্রতিদিন মঠ মিশনে খাওয়ার আগে দুই বেলা গীতার যে শ্লোকটা আমরা আবৃত্তি করি – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।*(৪/২৪)।। যেটা অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যেটা দিয়ে অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যাকে দেওয়া হচ্ছে সেও ব্রহ্ম, পুরো পদ্ধতিটাই ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।

এখানেও এই একই কথা বলা হচ্ছে, সেই পুরুষের যে পূজো হল সেটা যজ্ঞের দ্বারাই পূজো দেওয়া হল। ঈশ্বরের পূজা ঈশ্বরকে দিয়েই করা হল, এই ভাবে ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা যায় না। আমি যাকে ভালোবাসি তাকে তার ভালো লাগার জিনিষই তাকে দেব। ঈশ্বরের যজ্ঞ যেটা সেটা একমাত্র ঈশ্বর নিজেই, তাছাড়া আর কোন কিছুতেই তাঁর যজ্ঞ হয় না। সেইজন্য তাঁকে দিয়েই তাঁকে অর্পণ করা হল। *তানি ধর্মাণি প্রতমান্যাসন্* - এইটাই হচ্ছে সৃষ্ঠির প্রথম ধর্ম। সৃষ্টিতে প্রথম যে ভালো কাজ সেটা এইটা দিয়েই শুরু হল, ভালো কাজ মানেই হচ্ছে ধর্ম। এই জগৎ হচ্ছে একটা জগৎ রূপী বিকার – *জগদ্রুপানাং বিকারাং ধর্মং।* ধর্ম কি? এই জগৎ সব সময় ছিটকে যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে যে ধারণ করে আছে সেইটাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম যদি ধারণ না করে থাকত তাহলে এই জগৎ ছিটকে বেরিয়ে চলে যেত। জগতের সৃষ্টির পর সেই সৃষ্ট জগতকে ধারণ করে আছে, এইটাই ধর্ম, কারণ এইটাই জগতকে ধারণ করে আছে। প্রথম ধর্ম হচ্ছে প্রভুর পূজা। প্রভুর পূজা প্রভুকে দিয়েই হয়। আর পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে মনসা, মনে মনে, মানসিক প্রক্রিয়া। যখন আরণ্যকে আসবে তখন ঠিক একই জিনিষ হবে, তখন অশ্বমেধের মত যত যজ্ঞ আছে সব মনে মনে কল্পনা করে সম্পন্ন করা হয়। যারা প্রচুর জপ ধ্যানাদি করতে চান তাদের পক্ষে এই ধরণের একটা ভাবকে অবলম্বন করা খুবই কার্যকরী। শ্রীরামকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু দিয়েই প্রভুর অর্চনা করছি সেইটা তিনিই হয়েছেন, তাঁরই জিনিষ দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করছি। গঙ্গা জল দিয়েই গঙ্গা পূজা করা হয়।

বলছেন – *তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে। যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।* এই যে যজ্ঞ হল এইটাই হচ্ছে প্রথম পূজা, আর যারা এইগুলো সম্পন্ন করলেন তারা অন্তিমে উচ্চতম স্বর্গ লাভ করেন যেখানে আদি দেবতারা সবাই বাস করেন। আমরাও যখন এই ভাবে কল্পনা করব যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে এই যে যজ্ঞ হল, এই যজ্ঞের ফল হল স্বর্গপ্রাপ্তি, যারা যজ্ঞ করেছিলেন তার স্বর্গ পেয়ে গেলেন। স্বর্গের অনেক স্তর রয়েছে, কিন্তু এখানে বলছেন এই দেবতারা উচ্চতম স্বর্গ পেয়ে গেলেন যেখানে আদি পুরুষ ও আদি দেবতাদের বাস। যিনিই এই ভাবে যজ্ঞ করবেন, কিভাবে? ঈশ্বরই সব হয়েছেন, ঈশ্বর থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে, তাঁর পূজা তাঁকে দিয়েই করতে হয়, এই ভাব নিয়ে যা কিছু করা হবে সেটাই হবে প্রকৃত ধর্ম আর যে করছে তার উচ্চগতি লাভ হবে।

এখানে আমরা দুটো ভাব পেলাম – যিনি ঈশ্বর তিনিই সব কিছু হয়েছেন। যারা ধ্যান করেন, জপ করেন, ভজন করেন, পূজা করেন তাদের জন্য এটি একটি খুব উচ্চতম ভাব, এই ভাবকে অবলম্বন করে তাঁর ধ্যান ও ভজন করতে পারেন, যা কিছু আছে সেটা তিনিই। যখন পূজা করছি, জল, কোশাকুশি, ফুল, চন্দন, ধূপ, বিগ্রহ, আসন, পূজারী সব তিনিই হয়েছেন। এইটাই হচ্ছে পুরুষসূক্তমের দর্শন, সেটাকেই কাব্যিক রূপে বর্ণনা করে আধ্যাত্ম-পিপাসু মানুষের জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছে।